উৎস মানুষ

৩০বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● এপ্রিল-জুন ২০১০

বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৬৪

অস্থায়ী কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর, পোঃ (আর)গোপালপুর,

কলকাতা-৭০০ ১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/ ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com ই-মেল : jhilly_banerjee@yahoo.co.in

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
আহরণ		২
প্রবচনের এক ঝলক	অজানা চৌধুরি	৩
মধ্যবিত্ত বাঙালির ধর্মচেতনা	স্বরাজ সেনগুপ্ত	৬
বাংলায় নদীর সঙ্কট	সৌমিত্র শ্রীমানী	১৫
চির দত্ত প্রয়াত	মোহিত রায়	১৮
গর্ভনাশী জাদুবটিকা	শ্যামল চক্রবর্তী	১৯
গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব		২৪
প্রশ্নগুলো সহজ	পূরবী ঘোষ	২৫
ঔষধ শিল্পে সংস্কার	ভরত ডোগরা	২৭
গণপতি চক্রবর্তী	সমীরকুমার ঘোষ	২৮
শ্রমজীবী হাসপাতাল	সীতাংশু ভাদুড়ী	৩২
পুস্তক পর্যালোচনা	জয়ন্ত দাস	৩৪

আমাদের কথা

প্রায় পাঁচ দশক আগে '৮০-তে আসিও না' নামে একটা বাংলা সিনেমা এসেছিল। তাতে এক আশ্চর্য পুকুরের কথা আছে, যাতে চান করলে বৃদ্ধ যুবা হতে পারত। সেই পুকুরে চান করা, তার জল নিয়ে মানুষের উন্মাদনা, ব্যবসা—অনেক কিছু চলেছিল। গাঁজাখুরি গল্পে আমার খুব হেসেছিলাম। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, আইপডের যুগে বাস করছি। রাজ্যে মার্কসবাদী সরকারের অনুশাসনে রয়েছি তিন দশকের বেশি। তাই বুজরুকি দেখে হাসারই কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে দস্যুমোহনের গল্পের মতো 'কোথা হইতে কী ঘটিয়া যায়' যুক্তি আর আধুনিকতার শামলা আমাদের গা থেকে খুলে পড়ে। দৌড়োই দৈব পুকুরে ডুব দিতে। হাজার হাজার মানুষের চানের ধাক্কায় পুকুরের জল শেষ হয়। আমরা কাদা-পাঁকেই গিয়ে গড়াগড়ি খাই! এমন ঘটনা বিহার বা ওড়িশায় নয়, সংস্কৃতি আর বিপ্লবের দুর্গ খোদ কলকাতা থেকে ৬০-৭০ কিলোমিটার দূরেই সম্প্রতি ঘটেছে।

শিল্পায়ন নিয়ে বৃথাই মাথা ফাটাফাটি করছি। রাজ্যে জমি-বাড়ি প্রমোটারি শিল্প যে হারে বিকাশলাভ করছে, তা নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে আমরা দেমাক দেখাতে পারি। কিন্তু ধর্ম-শিল্পের উন্নয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত পড়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান নিলেই ধরা পড়বে, এই বাম রাজ্যেই প্রতি বছর বাবার মাথায় জল ঢালার ধুম বাড়ছে। এমনকি 'বাবা কি কম পড়িতেছে?' বলাও যাবে না। তারকনাথের পাশে লোকনাথরা চলে এসেছে। এগুলোয় শুধুই অশিক্ষিত মানুষজনের মৌরসিপাট্টা এমন ভাবলে ভুল হবে। শিক্ষিত শহুরে মানুষ হাঁটার ক্লেশ সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা মোটরে চেপে যান। দৈবপুকুর বেশ কয়েকটি জায়গায় মিলেছে। আশপাশের রাজ্য থেকেও বহু মানুষ এসেছেন। শিল্পের এমন উর্বর ক্ষেত্রকে অবহেলা করা আদৌ উচিত নয়। উল্টে ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে চানের ই-বুকিং থেকে তোয়ালে-গামছার অনুসারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে। বোতলবন্দী জল রপ্তানিও চলতে পারে। এ রকম আরও পুকুর খুঁজে বার করা যেতে পারে। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্র তো রয়েইছে, আঞ্চলিক শনি-শিল্পেরও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই টি প্রফেসনাল, বুদ্ধিজীবী বা ন্যাংটো-সংস্কৃতির শামলাটা গা থেকে খুললে আমরা তো সেই মধ্যযুগের বাঙালিই!

সম্পাদকমণ্ডলী

আহরণ

পণপ্রথা গীতি

শুনেন শুনেন সর্বজন শুনেন দিয়া মন
পণপ্রথার কথা কিছু করে যাই বর্ণন
অপ্সরীর মতো গৌরী দেখতে ফার্স্টক্লাশ ...
হরেন দেখে নিজের চোখে মত করে নিল
পণ সম্বন্ধে এবার কষাকষি হল
পঁচিশ হাজার টাকা দিবে হাতে দেবে ঘড়ি
মেয়ের গলায় চন্দ্রহার কানেতে মাগড়ি ...
কিন্তু গৌরীর বাবা অজয়বাবু সাত হাজার টাকা
দিতে পারেননি বলে কী হল :
বাকি সাত হাজার শুনে ব্যাজার হলেন হরেনবাবু
গৌরীবালাকে সঙ্গে নিলেন হয়ে ভীষণ কাবু
থাকে ঘরে জিজ্ঞাস করে শুন গৌরীবালা
সাত হাজার টাকা বাকি মনে বড় জ্বালা।
গৌরী শুনে মনে মনে দুঃখিত হইল
এনডিন খেয়ে গৌরীবালা পরলোকে গেল।

[উৎস, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬ আশ্বিন ১৩৯৫]

পট পটুয়া গীতি
— ডঃ বারিদবরণ ঘোষ
প্রকাশক: জিজ্ঞাসা এজেন্সিস্ লিমিটেড

পটচিত্র ও পটুয়াগীতি আমাদের সমাজ চিত্রকেই নানাভাবে তুলে ধরেছে। ভাল-মন্দ সব কিছুই শিল্পীরা সহজিয়া ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে, গানে। পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধি স্বাভাবিক ভাবেই উঠে এসেছে পটুয়া গানে। নরাগ্রাম, মেদিনীপুরের দুখুরাম চিত্রকরের গানে সমসময়ের সেই ছবিই ফুটে উঠেছে।

উৎস মানুষ বিশেষ সংকলন
প্রকাশিত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
(তৃতীয় মুদ্রণ)
দাম : ৬০.০০ টাকা

প্রতিরোধ
অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে

বইমেলায় উৎস মানুষ

কলকাতা বই মেলায় উৎস মানুষ ১৯৮৫ থেকে যোগদান করে আসছে। বইমেলায় নতুন বই বেরোবে আর তা নিয়ে উৎস মানুষের স্টলে ভীড় বাড়বে এ যাবৎ তাই হয়ে এসেছে। বইমেলায় যোগদান কোনো দিনই উৎস মানুষের কাছে নিছক বই বিক্রি ছিল না। এটা ছিল পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু। বহু দূরের বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, উপদেশ, পরামর্শ, এমনকি তীব্র সমালোচনা এবং মত-বিনিময়ের মাধ্যম। আর অশোকদার টান তো ছিলই। ধুলোয় কষ্ট হত, তবু অশোকদা প্রায় রোজই আসত। বহু লোক স্টলে এসেই খোঁজ করত — অশোকদা কোথায়! এই নিয়ে দু বছর, অশোকদা নেই, উৎস মানুষ বইমেলায়। পুরনো পাঠক-বন্ধুরা মেলায় আসেন আরেক কারণে — নতুন বই কিনতে। সেই সঙ্গে কেনা যে বই অন্যে পড়তে নিয়ে গিয়ে ফিরত দেয়নি, তা সংগ্রহ করতে। তাই নতুন একটা বই প্রকাশ সব সময়েই পত্রিকা গোষ্ঠীর লক্ষ্য থাকে। এবারেও মেলার খরচখরচা বাদ দিয়ে একটা নতুন বই বের করার চেষ্টা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। তবে 'প্রতিরোধ' দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উৎস মানুষ সংকলন, বেশ ক'বছর পর আমরা এবারের বইমেলায় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। নতুন আঙ্গিকে বইটি বেরিয়েছে। আগের বইটির সঙ্গে তফাৎ বলতে ঐটুকুই। উৎস মানুষের স্টলে প্রতিবারের মতো এবারেও বহু মানুষ এসেছিলেন। উৎস মানুষ যে এখনো বেরোচ্ছে অনেকে আমাদের স্টলে এসে তা জানতে পারলেন। বই কেনাকে কেন্দ্র করে উৎস মানুষকে ঘিরে যে উৎসাহ তা এবারেও দেখা গেল। অন্য প্রকাশকদের কিছু বাছাই করা বই আমাদের স্টলে রাখা হয়েছিল। সেগুলিও বেশ ভাল বিক্রি হয়েছে। আশা করা যায়, পরের বইমেলায় দেখা হবে। নতুন বই-সঙ্কলন তখন অবশ্যই থাকবে, এমন ভরসা পাঠক-বন্ধুরা রাখতে পারেন।

প্রতিবেদন বরুণ ভট্টাচায

প্রবচনের এক ঝলক

অজানা চৌধুরি

নেহাৎ আটপৌরে একটা বাঙ্গাল ছড়া, মেয়ে-জীবনের বেদনা-ভরা অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা —

পবন বাতাস করো রে — জাউ জুড়াইয়া যাক্
শাশুড়ি গ্যাছে কাঠ কুড়াইতে — বাঘে ধইর‍্যা খাক্
ননদী গ্যাছে জল আনতে — কুমিরে ধইর‍্যা খাক্
পবন বাতাস করো রে —

বুঝলেন কিছু? শাশুড়ি-ননদীর সঙ্গে কল্পিত বাঘ-কুমিরের সাক্ষাৎ ঘটুক এ-ধরনের আপাত-অসদৃশ ব্যাপারটার সঙ্গে জাউ-জুড়োনোটা জড়িত কী ভাবে? — এই প্রশ্ন? কেন, দেখতে পেলেন না এই চারটে পঙ্‌ক্তির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অভুক্ত, নিগৃহীত কিশোরী বউ, যে সভয়ে অপেক্ষা করছে থালায় ছড়িয়ে দেওয়া জাউসেদ্ধ জুড়িয়ে যাওয়ার। ঠাণ্ডা হলে তবেই না সে খাবে! পবনদেবকে তাই তার করুণ মিনতি — শাশুড়ি-ননদী (প্রশাসকেরা) আসবার আগেই তার জাউ যেন জুড়িয়ে যায়। জাউ অন্ন নয়, ফেলনা খুদ-কুড়ো। তা-ই বউটির কাছে পরমান্ন। পূববাংলার বিগতকালের এই ছড়াটি মেয়েদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থানটার একটা মোটা দাগের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। ছড়াটি আমি যে পূর্বসূরির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম তাঁকেও অনুশাসিত হতে হয়েছে অনুরূপ একটি প্রবচনের তর্জনী-সঙ্কেতে — 'গাছের শত্তুর লতা আর বউয়ের শত্তুর কথা' — অর্থাৎ বউরা থাকবে নতশির, চির-অনুগত, প্রতিবাদী কক্ষনো হবে না। প্রায় সত্তর বছর আগেও ছিল এই অবস্থা, সেটা ক্রমশ পাল্টাচ্ছে মেয়েদের মানস-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। আবার কিছু উল্টো স্রোতও বইছে। সে যাক। লৌকিক এই বাক্-রীতিগুলো এখন হয়ে উঠেছে ক্রমশ সমাজতত্ত্বের প্রত্ন-নিদর্শন, অতীত সমীক্ষার উপাদান।

প্রবচনের ঝলক-দর্শনে যদিও সমাজের বিস্তৃত অনুপুঙ্খ চেহারাটা প্রকাশ পায় না, তবু জীবাশ্মের মতো প্রত্নসামগ্রী যেমন চলমান জীবনের অতীত অংশটাকে ধরে রাখে তেমনি এই লৌকিক বোলবুলিগুলো মেয়ে জীবনের বর্তমান ধারার একটা অতীত প্রেক্ষাপট ধরে রেখেছে। এটাও ইতিহাস, এইখানেই এইসব সামাজিক প্রবচনের প্রাসঙ্গিকতা।

ঠিক এভাবেই মানুষের কৃষিকাজকে ঘিরেও বহু প্রবচন ভিড় করে আছে, এদেশে-ওদেশে, বিভিন্ন ভাষায়। শস্য-রোপণ, শস্য-পরিচর্যা, শস্য-সংগ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট আবহাওয়া ও তার রকমফের নিয়ে কৃষকের যে বাস্তব-অভিজ্ঞান তা থেকে তৈরি হয়েছে অজস্র ছড়া। আবহাওয়া-বিজ্ঞান যখন পরিমেয়তার পরিসরে সুস্থিত হয়ে দাঁড়ায় নি। শুধু মেঘ-বৃষ্টি আর ঋতু-বিভাজন জানে তখন এই কৃষি প্রবচনগুলো নিশ্চয়ই কৃষকের খুব কাজে আসত, এগুলোই চট্‌জলদি কিছু পূর্বাভাস-পরামর্শ জোগান দিত। আপাতত এই প্রবচনগুলোকে আমরা আবহাওয়া-বিজ্ঞানের ইতিহাসের গোড়ার দিকের ফেলে-আসা বাঁক বলতে পারি, প্রত্ন-প্রতীক যেমন।

সঠিক পর্যবেক্ষণের প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে একটা প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা, এই প্রচেষ্টা থেকেই বিজ্ঞানমনস্কতার উঠে-আসা। সাধারণ মানের হলেও পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-জারিত এই বিজ্ঞানমনস্কতার আঁচ পাওয়া যায় এই প্রবচনগুলোতে। 'খনার বচন' নাম দেয়া এই প্রবাদগুচ্ছ কোনো নিয়তিবাদের ফসল নয়, যদিও ফলিত-জ্যোতিষের কিছু বেনোজল ঢুকে আছে এর আঙ্গিনায়, সেটা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। এই প্রবচনগুলো কৃষকের অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞান, স্বভাবতই এগুলো আঞ্চলিক। কৃষক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ক্ষেতে, মাথার ওপরে আকাশ, সেখানে একটা সীমাবদ্ধ তার মধ্যে রোদ-মেঘ-বৃষ্টি-বাতাসের খেলা সে দেখছে তার শস্যের বাড়-বৃদ্ধি র সঙ্গে সঙ্গে, তার দেখা এবং বোঝার বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ তা তো থাকবেই। সে সব মেনে নিয়েও বলা যায় কিছু আবহাওয়া-সম্পর্কিত প্রবচন যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

প্রসঙ্গত এখানে বলি, খনার অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ। কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় (৫৫০খ্রিঃ নাগাদ) মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একটি অধ্যায় আছে — সেই সূত্রে 'খনা'র অবতারণা কিনা সেটা বিচার্য। সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ বললে বংশের গৌরববৃদ্ধি হয় অতএব ফলিত-জ্যোতিষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই মাটির-গন্ধ-মাখা প্রবচনগুলোর গৌরববৃদ্ধি র চেষ্টাও হতে পারে 'খনার বচন' নামকরণে। বৃহৎসংহিতার পূর্ববর্তী সংকলন-পুস্তক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) আর পরবর্তী রচনা কৃষি-পরাশরে কৃষি-আবহাওয়া নিয়ে যে-সব আলোচনা আছে তাতে ফলিত-জ্যোতিষর কোনো ব্যবহার নেই।

সমাজের উঁচুতলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বোধহয় একসময় ভাবতে অসুবিধে হত যে জাহাজের 'মাঝি-মাল্লা' ক্ষেতের 'চাষাভুষো'— এরা ঝড়-তুফানের চলন বা বৃষ্টিপাতের ধরন কি বুঝবে। কিন্তু নাবিক আর কৃষক, এদের মুখ্য কারবারই আবহাওয়া

নিয়ে। আবহাওয়া-বিজ্ঞানের 'ফোরকাস্ট' কথাটা এক নাবিকেরই চয়ন। তেমনি এই কৃষি-আবহাওয়ার প্রবচনগুলোও কৃষকের আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

আসুন, একটা প্রবচন একটু নেড়েচেড়ে দেখি —

কি কর শ্বশুর লেখা-জোখা —
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা
কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা —
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'
বলো গে চাষীকে ধরতে হাল —
আজ না হয় তো হবে কাল।

এইখানে বাস্তব-অভিজ্ঞতা-লব্ধ একটা পরম সত্য বলা হয়েছে — 'মেঘেই বুঝবে জলের লেখা'। মেঘের দল আকাশে ছড়িয়ে রেখেছে আবহবিদের 'ওয়েদার ম্যাপ', মেঘের চেহারা-চরিত্রই বলে দেবে স্থানিক বৃষ্টির পরিমাণ মোটামুটি। মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে বৃষ্টিপাতের আন্দাজ করা — এইখানেই কৃষকের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়। সীমাবদ্ধ তা বেশ কিছুটা থাকা সত্ত্বেও।

কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে যেমন চারদিকে স্তূপীকৃত হয়ে থাকে মাটি — বর্ষার জলবাহী জলদের চেহারাও তাই। আবহবিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম Cumulus, Altocumulus ইত্যাদি। প্রথমটা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার মাথা তোলে আর দ্বিতীয়টা দুই থেকে ছয় কি মি উচ্চতায় থাকে। (এইসব বিশাল-বপু বর্ষার পুঞ্জ মেঘেদের কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বপ্রক্রীড়ারত হাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, পিঠ বাঁকা করে ঘমশ্যাম হাতির দল দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ছে এখানেও সেই কোদালে-কুড়ুলে মেঘের চিত্রকল্প)।

বর্ষাকালে আকাশের নাটমঞ্চে এই জলভরা মেঘেরা বর্ষণের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ, যেন পুঞ্জীভূত বারুদের স্তূপ— শুধু ট্রিগারটি টেপার অপেক্ষা। ট্রিগারটা টিপবে কে? কেন, ঐ যে 'মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা' — ঐ বাতাস। আরো আরো অদৃশ্য জলকণা আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলাকর্ষী লবণ কণা নিয়ে উঠে আসছে উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমী বাতাস বঙ্গোপসাগর থেকে। দমকে দমকে ঢুকছে মৌসুমী বাতাস একটানা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নয় — বিরতি দিয়ে দিয়ে। বর্ষার মৌসুমী বাতাসের চলন এই। এই কারণে 'মধ্যে-মধ্যে দিচ্ছে বা' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই বাদল-বাতাসে বৈশাখের ঝড়ের ঝাপটা তেমন নেই (অর্থাৎ gustiness নেই) — কিন্তু তবু সে বেগবতী। এই দক্ষিণা বাতাস ডাঙায় ঢুকে পূবমুখো হয়ে এক চক্কোর মারলেই দক্ষিণবঙ্গে (বা উপকূলের কাছে) গড়ে উঠবে একটা ছোটখাটো নিম্নচাপ আবর্ত। হাওয়ার বেগ বাড়বে আর সেই হাওয়া জলীয় বাষ্পের অঞ্জলি নিয়ে ওপরে উঠে মেঘেদের আঁচল ভরাবে। বর্ষার এই নিম্নচাপ আবর্তগুলো উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এগোতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জলীয় বাষ্পের রসদটি ফুরিয়ে যায়। সারা বর্ষাকাল (ভালমত অঘটন না ঘটলে) দক্ষিণবঙ্গে এই পূবমুখো হাওয়ার নিম্নচাপ আবর্ত তৈরি হচ্ছে আর সেগুলো এগিয়ে চলেছে মৌসুমী অক্ষ বরাবর। বৃষ্টি আজ না-হয় তো হবে কাল। অঝোর ঝরন তো ঝরবেই। 'অভিমানের কালো মেঘে — বাদল-বাতাস লাগলে বেগে' — অঝোরেই ঝরবে, কবিও চান নি নিজেকে এই প্রকৃতিময়তা থেকে মুক্ত করতে। 'পূবে হাওয়া বয় — কূলে নেই কেউ — দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ' — এ-তো বর্ষার জলছবি। আল বেঁধে এই জল ক্ষেতে ধরে রেখে— মাটি চষে, বীজ ছড়ানো হবে। প্রত্যক্ষ দর্শন আর প্রকৃতিকে বোঝাপড়ার চেষ্টায় উঠে এসেছে কৃষি প্রবচনটি।

আরও একটা বলি — 'ভাদুরে মেঘ বিপরীত বায়, সেদিন বর্ষা কে ঘুচায়'। বাংলা ভাদ্রমাস (আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মাঝ বরাবর) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পুঞ্জ মেঘের সমাহার। সবাই জলীয় বাষ্পে ভরপুর আর এরই মধ্যে বাতাস বইছে বিপরীত দিক থেকে। পর্যবেক্ষণ প্রশংসাযোগ্য। দক্ষিণবঙ্গে (মুর্শিদাবাদ-মালদহ পর্যন্ত) ভাদ্রমাসে স্বাভাবিকভাবে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি স্তরের বাতাসের অভিমুখ দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব। যদি একটি নিম্নচাপ আবর্ত তৈরি হয় তবে খাড়াখাড়ি আবর্তটির (বা বাতাসের বৃত্তটির) পশ্চিমভাগে বাতাস বইবে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূবের বাতাস এমনিভাবে ঘুরে এসে দাঁড়াবে দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাতাসে এই আবর্তরচনায় 'বিপরীত বায়' কথাটি বেঠিক নয়। বাদুলে বাতাসের নিম্নচাপ আবর্তের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এই বিপরীত-বায়ে শুরু হবে প্রবল বর্ষণ। নিম্নচাপ আবর্ত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না মৌসুমী-অক্ষ বরাবর সে এগোতে থাকবে আর তার বৃত্তায়িত সব অঞ্চলেই বৃষ্টি হবে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটিতে বৃষ্টি হবে একটানা, সবচেয়ে বেশি। বলুন শুধু বাতাসের অভিমুখ বুঝে নিয়ে কেমন মোক্ষম কথাটির আভাস দিল চাষী, যা আজও আবহবিজ্ঞান বলছে।

কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই সদাচঞ্চল, সংক্ষুব্ধ বায়ুসমুদ্রের (যার তলায় আমরা আছি) তার বিশেষ একটি সময়ের ত্রি-মাত্রিক ছবি গড়ে তুলতে হয় আবহবিদকে। বাতাসের বিভিন্ন স্তরের পরিমেয়তার (তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, গতিবেগ, অভিমুখ ইত্যাদি) — প্রচুর তথ্যের সমাহার প্রয়োজন হয় সঠিক বিশ্লেষণে। এই তথ্যসমষ্টির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চিন্তা করে (যেমন, তাপ বাড়লে চাপও বাড়বে, বাড়বে বাতাসের জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি, ইত্যাদি), বাতাসের অবস্থার পূর্বাপর জেনে একেকটা অঞ্চলের সম্ভাব্য পরিস্থিতির রূপরেখা তৈরি করতে হয় আবহবিদকে। তবেই সেটাকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যাবে। পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তি কৌশল বাড়িয়ে, উন্নত গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে, তাপগতিবিদ্যার

(Thermodynamics) শাণিত বুদ্ধির সাহায্যে — সেই সত্যের আরো কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছে আজকের প্রায়-সাবালক আবহবিজ্ঞান। কিন্তু অপটু কৃষক তার সীমাবদ্ধতা নিয়েই শুধু তার ক্ষেতের ওপর বৃষ্টির কথাটা ভাবছে, সম্বল শুধু তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ভুল-ভাল তো তার হবেই, তবু বাহবা দিতেই হয়। 'বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান' — একথা যখন কৃষক একটু তির্যকভাবে বলে, তখন কিছু ভুল থেকে যায় অবশ্য। যেমন, প্রবল বর্ষণে নিম্নচাপ আবর্তের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যখন ক্লান্ত তখন দক্ষিণ বায়ুর প্রবাহ উঠলেই সেই ক্লান্তি দূর হবে এ-কথা সত্যি, কিন্তু নদী-অববাহিকায় নদী বানের সমাপ্তি ঘুচবে কি সেই দক্ষিণার দাক্ষিণ্যেই? এ-কথা বলা যায় না। কারণ বন্যার আরও কারণ থাকে, সেকথা আলোচনার পরিসর এখানে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখ্য ছড়া — 'পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়, সেই বৎসর বন্যা হয়',— জুন-জুলাই মাস হু হু করে দক্ষিণা বাতাস ঢুকছে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত, বর্ষার মৌসুমী-অক্ষরেখাটি হিমালয়ের পায়ের কাছে তরাই অঞ্চলে শুয়ে আছে। প্রবল বর্ষণ ঘটিয়ে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঢাল-তরোয়াল না থাকলেও কৃষি আবহাওয়ার প্রবচনগুলো অভিজ্ঞতার প্রাণরসে চনমনে।

কিন্তু তথ্যের আনুপূর্বিক হিসেব আরেকটু নিখুঁত হলে ভাল হত। যেমন, 'দূর সভা নিকট জল আর নিকট সভা দূর জল'। চাঁদ বা সূর্যের সাত রঙের বলয়-শোভাকেই নিশ্চয় সভা বলা হচ্ছে। এই 'সভা'-র বহুরকম সমাবেশ ঘটে, বেশির ভাগ ঘটে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। এদেশে যেটা সচরাচর দেখা যায়, সেটা বাইশ ডিগ্রি ব্যাসার্দ্ধের একটি রঙিন বৃত্ত চাঁদ বা সূর্যকে ঘিরে। ছেচল্লিশ ডিগ্রি ব্যাসার্দ্ধের কিছু বৃত্তচাপ বা ছড়ানো বৃত্তাংশও দেখা যায়। বৃত্তের ভেতরের পরিধিতে লাল রং — কিছুটা ফ্যাকাশে, বাইরে ক্রমান্বয়ে রামধনু-রঙ অনুসারে বেগুনিপারে এসে থামবার কথা। তবে হলুদ-সবুজের পরে সবই সাদাটে দেখায়। যাই হোক, এই বলয়-কবলিত চাঁদ আর সূর্য দেখা যায় আকাশে যখন ঊর্ণা-স্তর মেঘের হাল্কা একটি আবরণ থাকে। ঊর্ণা-স্তর মেঘ বা Cirrostratus মেঘের উচ্চতা ছয় থেকে আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদেশে গ্রীষ্মকালে হিমাঙ্কস্তর প্রায়ই পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। ফলত এই ঊর্ণা মেঘে থাকে হিম-শীতল জল (Supercooled water) আর বরফকুচি। বরফকুচিগুলো যেমন হয় ছ'কোনা সমন্বিত। এই বরফকুচিতে সূর্য বা চাঁদের আলোর প্রতিফলন-প্রতিসরণ ঘটে আর রামধনুরঙের সূর্যবলয় বা চন্দ্রবলয় তৈরি হয়। যখন বলয়টা ছোট ব্যাসার্ধের তখন সূর্য বা চাঁদের মুখ-ঢাকা আবরণটার বিস্তৃতি অবশ্যই কম আর যখন বলয়টা ছেচল্লিশ ডিগ্রি ব্যাসার্ধের তখন মুখাবরণের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক বলতেই হবে। অর্থাৎ আকাশে Cirrostratus মেঘের সমাহার আরও বিস্তৃত হয়েছে। Cirrostratus তার ঘনত্ব বাড়িয়ে Altostratus মেঘের স্তরে নেমে আসতে পারে। মধ্য-স্তরের এই মেঘ টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি ঝরায়। অবস্থা অনুকূল হলে ঝিম্-ঝিম্ করেও নামতে পারে। কোনো পরিসংখ্যান ভালভাবে নেই এদেশে। সম্ভাবনার খসড়াকে পরিসংখ্যানে পরিশীলিত করে নেওয়া দরকার বিজ্ঞান-চর্চায়। আবহবিজ্ঞানে এই পরিসংখ্যান এবং তার বিচ্যুতিও পরখ করে দেখা হয়।

শস্যের বাড়-বৃদ্ধির প্রতিটি পর্যায়ে জল-হাওয়া-রোদের চাহিদা বদলায়। এক কথায় চাষীকে যেমন স্থানিক জলবায়ুর চলনটা জানতে হয় তেমনি জানতে হয় প্রতিদিনের আবহাওয়াটাকেও। জলবায়ু একটা জায়গার প্রায় পঞ্চাশ বছরের গড় আবহাওয়া — এটা মোটামুটি আঁচ করতে পারা যায়। প্রতিদিনের আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাটাই বুঝে নেওয়া বেশ মুস্কিলের। বর্ষার বর্ষণটা কৃষকের কাম্য। কিন্তু সেই বর্ষণ ঘটে যদি অগ্রহায়ণে তবে চাষী সর্বস্বান্ত হবে। 'যদি বর্ষে আঘণে রাজা বেরোয় মাগনে'। অগ্রহায়ণে ফসল তোলার সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তবে পাকা ধান মাঠেই ঝরে পড়বে। কিন্তু যখন চাষী বলে 'যদি বষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' — এটা তার বহু বৎসরের জলবায়ু আর শস্যের বাড়বৃদ্ধির একত্রীভূত অভিজ্ঞতা। রবিশস্যের ফলন এই বৃষ্টিতে ভাল হয়, রোগপোকার আক্রমণ কমে।

শস্যরোপণবিধি নিয়েও রয়েছে অজস্র ছড়া। 'কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি'— ফাঁক ফাঁক করে ধানের চারা রোপণ করলে মোটা-মোটা গুছি হবে, অধিক শস্য জন্মাবে। 'রোদে ধান — ছায়ায় পান'— এটা তো সাধারণ জ্ঞান। 'পান করো শাওনে, না খেয়ে ফুরোয় রাবণে'— এটা চাষের অভিজ্ঞতা। 'ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো' — এই ব্যাঙ-প্রশস্তি ঋগ্বেদেও আছে। মুনি-ঋষিরা মোটেই পরিবেশ-উদাসী ছিলেন না। এইসব বোধ-বুদ্ধির লৌকিক বেদ শ্রুতিবাহিত হয়ে একজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে এসেছে। কুসংস্কারের বুনো ঘাস উঠে আসেনি এই প্রবাদ-গুচ্ছে — এ কথা বলব না। নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা বাদ দিয়েও আছে মানুষের মননশক্তির বিজ্ঞানমনস্কতা। এই বিশেষ শক্তিটি তো একদিনে তৈরি হয়নি। বহু ভুলভ্রান্তি পার হতে হতে একটা Cumulative থিঙ্কিং-এর পথে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও সে চলছে সেই পথটা ধরেই যা 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা বহু দিবসের সুখে-দুখে আঁকা'। তাই কৃষকের, জেলের, নেয়ের, কামার-কুমোরের, মউলেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রবাদবচনগুলো খুঁজে দেখতে দোষ কি? বিজ্ঞানমনস্কতার উৎস তো মানুষই।

মধ্যবিত্ত বাঙালির ধর্মচেতনা, ধর্মান্ধতা এবং...

স্বরাজ সেনগুপ্ত

নিবন্ধের প্রারম্ভেই বলে রাখছি, আমি আমার নাতিদীর্ঘ আলোচনায় বাঙালি জীবনে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মদর্শন, ধর্মশাস্ত্র চর্চার দেয়াল-ঘেরা বৃত্তে ঢুকব না। এখানে আলো বাতাস নেই, আকাশ নেই। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবার বাসনাও আমার নেই। ধর্মতত্ত্বের আবর্ত, যাকে কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং বলেছেন Whirlpool of the mysteries of religion, আমাকে এবং সেইসঙ্গে পাঠককেও অতলায়তনে টেনে নিতে পারে। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব অথবা ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত কোনো সত্যের ভূমিতে এসে দাঁড়াতে পারা যাবে না। বিশেষত হিন্দুধর্মের (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাখা প্রশাখাকে অন্তর্ভুক্ত করেই বলছি) প্রবর্তক ও প্রবক্তারা উদ্দেশ্যানুরূপ এলোপাথাড়ি প্রস্তাব-প্রস্তাবনার গোলোকধাঁধায় সত্যজ্ঞানকে আড়াল করে রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানতে হবে, জানতে চেও না। জানতে চাইলেই মাথা মাটিতে খসে পড়বে। যে ভয়ঙ্কর শক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই তাকেই ভয় করে কোটি কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে শুধু মেনেই এসেছে। ফলে শাস্ত্র-মন্ত্র-তন্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ বিচারে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা দু-চারজনের বেশি ছিল না কোনোকালে, এখনও নেই। উচ্চবিত্ত, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তাঁদের দিনকে দিন ধর্মচেতনার (চেতনা বলে কিছু নেই, আসলে অভ্যাস অথবা বিচেতন আচার আচরণ) সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনকে মেলাতেও চান না। ঈশ্বর আছেন, অসংখ্য দেবতারা আছেন, অবতারেরা আছেন। ধার্মিক বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ চরিত্রধর্মে এতটাই ভীতু যে তারা কোনো একটি দেবতা ও অবতারকেও ছাড়তে পারেন না। (এমনকি সেদিন যার জন্ম হয়েছে, তাকেও না। ধর্মবিশ্বাসেও কোনো সময়ে স্থির একটি ভূমিতে দাঁড়াতে পারে না।) তাঁরা তো আছেনই। প্রশ্ন নেই, সংশয় নেই। কোথায় পাবেন তাঁদের? 'শ্রীচরণেষু' সম্বোধনে গুরুকে চিঠি লিখলেই, তিনি দুহাত তুলে চিঠির উত্তর দেবেন। অর্থাৎ তিনি পাইয়ে দেবেন। সামনে টাকার তোড়া রেখে শুধু পদধূলি লেহন করলেই কাজ হবে। সুতরাং তত্ত্বটত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথাটাকে কষ্ট দিতে চান না বিরাট বিরাট পণ্ডিতজনেরাও। (পাঠক, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবাকে স্মরণ করুন) আঙুলে আঙুলে পান্না-নীলার আংটি আছে, গুরুদেবের চরণস্পৃষ্ট কবচ-মাদুলি অঙ্গে লেগে আছে। কাকে ভয়? কেন ভয়? এই নির্ভয়-ভাবনাই শিক্ষিত (!) বাঙালির প্রধান ধর্মচেতনা। বলেছি 'প্রধান' আরও অনেক অন্ধ অলিগলি আছে। সে-সব অলিগলির অন্ধকারেই আমি পাঠককে নিয়ে যেতে চাইছি কারণ অন্ধকার-অভিজ্ঞ না হলে আলোর পথ খোঁজা যাবে না।

আর একটি কথা বলে নেওয়া ভাল, বলে না নিলে একটা বড় ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। আমি যে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করছি তার সঙ্গে ইংরেজি duty, attribute, property প্রভৃতি শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার এই নিবন্ধে ধর্ম নিছক religion অথবা religious practices ভিন্ন কোনো মানবিক মাত্রা নেই। আজ পর্যন্ত এই 'ধর্ম' মানুষের ভাবভাবনা চিন্তাচেতনা, কাজকর্মকে 'বিশেষিত' করে (বাংলা অভিধানে এমন 'বিশেষিত' শতাধিক শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) মানুষকে অস্বীকার করেছে। একটিমাত্র উদাহরণেই আমার বলার কথাটি বুঝতে সুবিধে হবে। *'ভদ্রলোক' ধর্মনিষ্ঠ, কখনো অন্যায় পথে চলেন না*। ন্যায়-অন্যায়ের বোধের সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই, যোগ আছে ভালমন্দ বিচার ক্ষমতার অর্থাৎ সঠিক যুক্তি-তর্ক-পদ্ধতির অনুশীলন ও অনুসরণের। এভাবেই মানুষের সমস্ত চরিত্রগুণের সঙ্গে ধর্মকে এঁটে দিয়ে মানুষের মানহানি করা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। আর ধর্মনির্ভর নির্ভয় মানুষজনও মানহানির মামলা দায়ের করতে গররাজি, ধর্মের গরাদেই তাঁরা নিশ্চিন্ত, সুতরাং সুখীও।

দুই

পাঠক, এবার আসুন, আমরা অলিগলির অন্ধকারে ঢুকি। একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত (আহা, ধর্মচেতনা বা ধর্মবিকার আমাদের কতরকমের দুঃস্বপ্ন ও সুখস্বপ্ন দেখায়!) দিয়েই শুরু করছি। আমাদের বাড়ির বুড়ি বড়মা মাঝরাতে ঘুমের অন্ধকারে 'কী সব্বোনাশ অইল রে' — বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। সারা বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে গেল, সবাই একে একে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। আমার মা-ও আছেন। আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরাও আছি। সবাই এসে পড়ায় তাঁর কান্নাও থামল। তিনি সব্বনেশে কথাটিও ভাঙা ভাঙা গলায় শোনালেন— মা দুর্গা কুপিত হয়েছেন, কারণ একটি নয়, দুটি। এক, মুসলমান ইদ্রিশ মিঞা (আমার বাবার স্কুলের সহকর্মী, আরবির শিক্ষক) দেবীমণ্ডপের পাশের উঠোন পেরিয়ে আমাদের ঘরে আসেন। বাবা তখন ইংরেজের জেলে, তাই আমাদের খোঁজখবর নিতে আসেন। সুতরাং মণ্ডপ অপবিত্র হয়েছে। দুই, আমার ঠাকুরমা, বাবা একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে, 'মা'কে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলেন;তিনি হঠাৎ 'স্বর্গে' গেলে এই ধর্মপরায়ণার মানতরক্ষায় বাবা-মা উদ্যোগী হন নি। সুতরাং সর্বনাশ অনিবার্য। রাঙা ঠাকুরপো (অর্থাৎ আমার বাবা) এক হয় রোগে মরণাপন্ন হবে, আর নয় দ্বীপান্তরে যাবে (বাবার

বন্ধু বরিশালের সুরেশ বিশ্বাস দারোগা খুনের অভিযোগে মাস তিনেক আগে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন)। বাড়ির চার-পাঁচজন এম. এ. পাস বয়স্ক পুরুষকেও (কেউ স্কুল-শিক্ষক, কেউ কলেজ-শিক্ষক, একজন তো খুলনার দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ) দেখলাম আতঙ্কগ্রস্ত। শুধু মা বললেন, পাঁঠাবলি আমি হতে দেব না, আর আপনার রাঙা ঠাকুরপো দারোগা খুনে অভিযুক্ত নন, তাঁর দ্বীপান্তরও হবে না। আর ইদ্রিশ মৌলবির মতো ভদ্র সজ্জন মানুষকে আমি অসম্মানিত করতে পারব না। শুনে বড়মা আবার কাঁদতে শুরু করলেন। বড় হয়ে ভেবেছি, বড়মা সত্যি স্বপ্ন দেখেছিলেন, না স্বপ্নটাকে বানিয়েছিলেন? আমার বাবা-মাকে তিনি ভালবাসতেন, এমন একটা দুঃস্বপ্ন তিনি বানাতে যাবেন কেন? আসলে বড়মার অবচেতন-অচেতন সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস ইদ্রিশ মৌলবি এবং মানতরক্ষার নিরুৎসাহকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। হয়ত বহুদিন ধরেই এই মজ্জাগত বিশ্বাসের ঘুণপোকাটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। দুঃস্বপ্নটা কেঁদে ওঠা সেই যন্ত্রণার মোচন।

এ তো হল এক স্বপ্নের কথা। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা যে ছিল তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ১৯০৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কজন মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন সে তথ্য এখন আর আমাদের অজানা নেই। ভারত সরকার প্রদত্ত ভাতা-প্রাপক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা এবং তাম্রপত্রের সংখ্যা তো এখন নথিভুক্ত হয়ে আছে। এ সংখ্যাটি বাঙালি মধ্যবিত্তের গর্ব করার মতো নয়। দলে দলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হেসে হেসে ইংরেজের জেলে গেছে — এ তথ্য আসলে একটা মিথ। কোটিতে হাজার কি খুব গৌরবজনক? অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিই চাকরি, পদোন্নতি, খেতাব প্রভৃতির লোভে সংগ্রামী ব্যক্তিকে দূরেই রাখতেন অথবা এড়িয়ে চলতেন। গ্রাম-গঞ্জে-শহরে — সর্বত্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বলের বোন সুষমা বলের বিয়ের সম্বন্ধটা প্রথমে ভেঙে গেল এই কারণে। অথচ পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নানা খণ্ড মিলে যে অখণ্ড বাংলা, সেই বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 'ধর্ম' নিয়ে যে জীবনধারায় ভাসতেন তা ছিল মানুষ ও মনুষ্যত্ববিরোধী, মানুষের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। কারণ অধিকাংশ ধর্মধ্বজী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির নিম্নবিত্ত অথবা বিত্তহীন তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও জনগোষ্ঠীর প্রতি আচরণে উপেক্ষা ও ঘৃণা সুস্পষ্টভাবেই আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমার শৈশবে, কৈশোরে। আমি দেখেছি, দুর্গামণ্ডপে গ্রামের কোনো ধোপা, নমঃশূদ্র, বাগদি, কামার, চামার প্রভৃতি (তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেও) ঢুকতে পারত না। এমন কি ঢাকিকে ঢাক বাজাতে হত মণ্ডপের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে। এ ছবি কোনো একটি বিশেষ গ্রামের নয়, সেকালের (নিশ্চিতভাবে একালেরও) সারা বাংলাদেশের। অথচ দুর্গামূর্তিকে খালবিল, নদী পুকুরে 'বিসর্জন' দেবার সময়ে ডাক পড়ত ফটিক ধোপা, কালু মণ্ডল এমন কি বিধর্মী করিম মাঝিরও — মূর্তিসহ কাঠামো বহন করতে, নৌকোয় তুলে মাঝনদীতে নিয়ে যেতে। তখন তো আর দেবীমূর্তির 'প্রাণ' নেই, মাটির পুতুল মাত্র, এরা ছুঁলেও 'অধর্ম' হবে না। মাটির পুতুলে প্রাণ যে কোনো সময়েই ছিল না, এই অতি সাধারণ বোধটুকুও হেডমাস্টার, ডাক্তার, উকিল, জজ ইত্যাদি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও নেই দেখেছি।

'স্বদেশী' (এমন কি ইংরেজের জেল-ফেরত 'স্বদেশী'ও) শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখেছি বাড়িতে সংখ্যাতীত দেবদেবীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে। এই দেবদেবীদের মধ্যে শিবদুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে মনসা শীতলা রক্ষাকালী ইত্যাদি অনেকেই আছে। মনসা অথবা কালীপূজায় পাঁঠাবলির রক্ততিলক তাঁকেও কপালে লাগাতে দেখেছি। ঢাকঢোল কাঁসরঘণ্টার বাদ্যবাজনার তালে তালে নাচতেও দেখেছি। ইংরেজ শাসনের বন্ধনের মধ্যে বোধ করি তাঁর যন্ত্রণাকাতর মন এর মধ্যে মুক্তির স্বাদ পেত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তিনি পাঁঠাবলি দিয়েই নিধন করছেন এমনটা হয়ত বিশ্বাস করতেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চাইতেন দেবীমাহাত্ম্যের জোরে। তিনি যে ধর্মান্ধতায় মিথ্যার মিথকেই আঁকড়ে ধরছেন এই সত্যকে তিনি মানতেন না, জানতেনও না।

একটি লজ্জা ও বেদনাদায়ক তথ্যের উল্লেখ না করে পারছি না। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডিকে খুন করেছিলেন প্রয়াত বিমল দাশগুপ্ত — তিনি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসেছেন ১৯৪৭-এর শেষদিকে তাঁর বাসন্ডা গ্রামের বাড়িতে। তাঁরই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কালীর কাছে মানত করা হয়েছিল (মানত করেছিলেন তাঁর দুই দিদি) 'দ্বাদশ পশু' অর্থাৎ বারোটি পাঁঠা। সারা গ্রামের মানুষ ধুমধাম করে পাঁঠাবলির 'মহোৎসবে' যেভাবে মাতন-নাচন দেখিয়েছিল এখন মনে পড়লে তাদের আর 'সভ্য' ভাবতে পারি না। বিমল দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করেন নি — তাঁর বাড়ির উচ্চশিক্ষিত নারীপুরুষরাও (দু'জন এম. এ. পাস নারীও ছিলেন, একজন তো কলেজে অধ্যাপনা করতেন) এই যুক্তিবুদ্ধি সভ্যতাবিহীন, এই ধর্মান্ধ মাতামাতিতে উল্লসিতই ছিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশ বছর পরে মেদিনীপুর কলেজ-সংলগ্ন বিমল দাশগুপ্তের বাড়ি গিয়ে দেখেছি, স্ত্রী ও তিন কন্যা নিয়ে কী দুঃসহ অর্থকষ্ট তাঁর। তবু সারা বাড়িতে অসংখ্য দেবদেবীর পট (পারলে হয়ত বত্রিশ কোটি পট অথবা মূর্তিই তিনি বাড়িতে রাখতেন) আর সকাল-সন্ধ্যা তাদের পূজাপাটের কঠোর নিয়মরক্ষায় তাঁর স্ত্রী, আমার ঝুনুদিকে (সম্পর্কে তিনি আমার দিদি ছিলেন)

অতিষ্ঠ ও উত্ত্যক্ত করে রেখেছেন। এক সময়ে ঝুনুদি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন। পেডি হত্যার দুঃসাহসী স্বাধীনতা-সংগ্রামীর এই ধর্মভীতিকে ধর্মান্ধতার অন্ধকারে অধঃপতন ছাড়া আর কি বলা যাবে! শেষ জীবনের কয়েক বছর ধরে তিনি মহিলা সমাবেশে ভাগবত গীতা পাঠ করে শোনাতেন — আমার ধারণা, তাদের অনেকেই জানত না, এই শীর্ণদেহ মানুষটি প্রথম যৌবনের দুর্জয় সাহস নিয়ে এক ইংরেজ জেলা-শাসককে হত্যা করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়। দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন তিনি ধর্মান্ধতার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাধীন। এমন তথ্যাশ্রয়ী উদাহরণ আরও আছে, একটি দুটি নয়, শ'য়ে শ'য়ে।

তিন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূম জেলার নলহাটির (নলহাটি একটি পীঠস্থান, দেবীর কণ্ঠনালী নাকি এখানে ছিটকে পড়েছিল) বাড়িতে আমি দুটি কাঠগড়া দেখেছি, ছোট ও বড়। শুনেছি ছোটটি পাঁঠা বলির জন্য, বড়টি মোষ বলির জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত এই বলি প্রথা তাঁর বাড়িতে চালু ছিল। (উনিশ শতকের রামতনু লাহিড়ী ছিলেন লোকশিক্ষা ব্রতী, যুক্তিবাদী, শাস্ত্রবিরোধী নির্ভীক মানুষ, তাঁর নামাঙ্কিত অধ্যাপকের পদে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন!) ছাত্রজীবনে তাঁর বাড়িতেও গিয়ে দেখেছি, পূজাপাঠের সাড়ম্বর আয়োজন। অর্থাৎ পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণের উত্তরাধিকার তিনি ভক্তিসহকারে বহন করেছেন। অথচ এই বীরভূম জেলায় একদা বৈষ্ণব ভাবালুতার বান ডেকেছিল। আমি এই নিবন্ধেই আগে বলেছি, মধ্যবিত্ত বাঙালি-স্বভাবে বৈপরীত্য ছিল ধর্মাচরণে। সে একই সঙ্গে কালী ও কৃষ্ণের উপাসনায় আশ্বস্ত থাকে। দোল-দুর্গোৎসব এদেশে সমাসবদ্ধ পদ। যাদের আমরা বিত্তহীন নিম্নবর্গীয় মানুষ বলি, তাদের ধর্মবিশ্বাস এককেন্দ্রিক অর্থাৎ এক দেবতায়। (বিস্ময়কর ব্যতিক্রম আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) আমি সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দু-তিনবার গেছি, তাঁর বাড়ির ঘরের দেওয়ালে কোনো দেবদেবীর ছবি দেখিনি, নিত্যদিন পূজাপাটের অভ্যাসও তাঁর ছিল না। তাঁর প্রয়াণের পর অধ্যাপক গোপাল হালদারের স্মৃতিকথা থেকেও এ তথ্য আমরা জেনেছি।

মোটের উপর ঔপনিবেশিক ভারতের যে অংশটিকে আমরা বঙ্গজননী বলে সভক্তিতে সম্বোধন করে এসেছি তার সন্তানেরা ধর্মান্ধ বাঙালি হয়েই থেকেছে, সত্যার্থে মানুষ হতে পারে নি। উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চ অভিমান যাঁরা মনে মনে পোষণ করতেন, তাঁদের ধর্মান্ধতা ছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত (এখনও আছে)। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এত রকমের অবশ্যপালনীয় ধর্মাশ্রয়ী আচার-বিচার শাস্ত্র-সংহিতার বিধান ছিল যে মনেপ্রাণে তারা মৃতপ্রায় হয়েই 'জীবন' ধারণ করত। এই মৃতপ্রাণে যুক্তিবুদ্ধির চর্চা করার উৎসাহ উদ্যম থাকতে পারে না, ছিলও না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায়, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে, বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায়, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার অনুশীলনে মধ্যবিত্ত সমাজের যে অংশটি আমাদের ঋণী করে রেখেছেন তা অতি ক্ষুদ্র, অনায়াসে তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। বৃহত্তম অংশই প্রাত্যহিক জীবনে ছিল মানবিক প্রত্যয়বিহীন। মুক্তবুদ্ধি মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য, হয়তো আজও তাই। এই বৃহত্তম অংশ আচার-বিচারে ছিল অদ্ভুত, বৈপরীত্যে খণ্ড খণ্ড, একটা গোটা মানুষ ছিল বিরল। আমি দেখেছি, গ্রামগঞ্জে, জেলা-মহকুমা শহরে একদিকে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হচ্ছে, অন্যদিকে মণ্ডপে মণ্ডপে পাঁঠা বলি হচ্ছে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ছে, নিজেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিধারী — কিন্তু পদে পদে পঞ্জিকা, গ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, নানাবিধ রত্ন পাথর তাবিজ মাদুলি কবচ, ত্র্যহস্পর্শ-দিকশূল, পীঠ, থান (পূর্ববঙ্গে খোলাও বলা হত) মঠ-মন্দির, গুরুর প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য। শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন বর্ধমানের জেলা-জজ (গ্রাম পলসোনা, মহকুমা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান, বৈষ্ণব-তীর্থ শ্রীখণ্ড-সংলগ্ন, আমি এই গ্রামে কয়েকদিন ছিলাম)। তাঁর পিতামহ-পিতার উৎসাহে ও উদ্যোগে এখানে চড়কের মেলা বসত। তিনিও এমন 'মূল্যবান' উত্তরাধিকার বর্জন করতে পারেন নি! খুঁটিতে লম্বা বাঁশের আড়া বেঁধে শুধু গাঁজাখোর সাধুরা ঘুরপাক খেত না, বুকে গামছা বেঁধে আড়ার সঙ্গে পাঁচ-ছয়-সাত বছরের শিশুদেরও ঘুরপাক করানো হত। শিশুরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারত না। আর কাঁদলেও ঢাকঢোল, হুলুধ্বনি, জয়ধ্বনিতে তাদের কান্না শোনাও যেত না। বাবা-মায়েরাও ভাবত 'পুণ্যি' জমছে তাদের জীবনে। আরবদেশের উটদৌড়ের চেয়ে একে কি কম বর্বরোচিত মনে হয়? এই তথ্যের উল্লেখ করলাম এ কারণে যে এই চড়কের মেলার বয়স একশ বছর ছাড়িয়ে গেছে। বলবার কথা এই যে, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে আমরা যতটা পরাধীন ছিলাম, কুৎসিত বীভৎস ধর্মান্ধতার কাছে ততটাই পরাধীন ছিলাম। আমাদের এই ধর্মান্ধতাকে ইংরেজ শাসকরাও অদৃশ্য অস্ত্রের মতো কাজে লাগিয়েছে। চীনের মানুষের আফিমের নেশাকে যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা বহুযুগ ধরে উৎপীড়ন ও শোষণের কাজে লাগিয়েছে, আমাদের ধর্মান্ধতার নেশাকে ইংরেজ শাসকরা সুকৌশলে ব্যবহার করেছে। চীনের নেশা কেটেছে, আমাদের নেশা কাটে নি, কাটবে, তেমন অনুকূল আলোবাতাসও তো নেই।

নলহাটির মতো পীঠস্থান অখণ্ড বাংলাদেশে আরও আছে। বরিশাল জেলাতেই তো দুটি আছে, শিকারপুরের তারাবাড়ি (দেবীর একটি চোখের তারা এখানে পড়েছিল!) পোনাবালিয়ার

শিববাড়ি। (দেবীর একখানি শ্রীচরণ অথবা শ্রীহস্ত এখানে পড়েছিল। অনেককে বলতে শুনেছি, দেবীর প্রাণপিণ্ড অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডই নাকি এখানে পড়েছিল!) নানা মুনির নানা মত, ছেলেবেলায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের এ নিয়ে বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক শুনেছি। ভাবতে এখন লজ্জা এবং দুঃখ হয় — এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা একবারও ভেবে দেখলেন না, বেদনাকাতর শিব তো প্রলয়নাচন নেচেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, তাহলে বিষ্ণুচক্রে ছিন্নভিন্ন দেবীর এতগুলি প্রত্যঙ্গ শুধু বঙ্গভূমিতেই ছিটকে পড়ল কী করে! সারা পৃথিবী নয়, শুধু বঙ্গভূমিই পুণ্যভূমি!

একটি মর্মান্তিক ঘটনা মনে পড়ছে। পোনাবালিয়ার (বরিশাল) যে শিববাড়ির আমি উল্লেখ করেছি, সেখানে ১৯৩০-এ একটা বড় দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গা সেখানে হওয়ার কথা ছিল না — বহু শিক্ষিত মানুষের বাসভূমি এই গ্রাম — পাশের কুলকাঠি গ্রামও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। আট দশ ঘর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানও ছিল। পেশায় কেউ স্কুলশিক্ষক, কেউ সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে কেরানি। হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি মিলেমিশে বাস করছে বহুকাল ধরে। হাইস্কুলের মৌলবি এবং প্রধান শিক্ষক (আমার বাবা রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন প্রধান শিক্ষক) স্কুলসংলগ্ন দুটি ঘরে থাকতেন। দাঙ্গার কারণ কী? কবন্ধ-শক্তির ধর্মান্ধ উন্মত্ততা। মহরমের তাজিয়াবাহী একটি মিছিল শিবমন্দিরের পথেই যাবে, যদিও ভিন্ন পথ ছিল। হিন্দুরাও ততোধিক ধর্মান্ধ, তারা হিংস্র হয়ে উঠল মিছিলের একটি নিশান মন্দির সংলগ্ন পবিত্র বেলগাছটিকে ছুঁয়ে ফেলেছে বলে। লাগল দাঙ্গা। পুলিশ এসেছিল। গুলি চলল। হতাহত হল শতাধিক হিন্দু-মুসলমান। মৃতদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশি — দশজন। বাবার মুখে শুনেছি, মৌলবি স্যার ঘরে ফিরে সারারাত কেঁদেছিলেন। কেন? সহজেই বুঝতে পারি। পরের ঘটনা আরও ঘৃণ্য ও ধর্মান্ধতার জঘন্য পরিচায়ক। দাঙ্গার দুদিন পরে স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হলেন পোনাবালিয়া গ্রামে, সঙ্গে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। তাঁদের অবস্থানের তৃতীয় দিনের রাত্রিশেষে দেখা গেল, মসজিদের দিকের রাস্তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্গন্ধ নোংরা আবর্জনায় ঢাকা পড়েছে আর গাছের গায়ে গায়ে পোস্টার, তাতে লেখা ছিল — 'এই পথে তোদের আল্লা হাঁটিয়া গিয়াছে।' আমার বাবা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি এবং বি এম কলেজের উপাধ্যক্ষ, গণিতের অধ্যাপক চিন্তাহরণ রায়চৌধুরি (দু'জনেই ওই গ্রামের মানুষ, দাঙ্গার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন) বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন এমন ঘৃণ্য কাজে। তাঁরা অপমানিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটিকে এমন বিস্তার করে বললাম হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ধর্মান্ধতার ভয়ংকর চরিত্রটি তুলে ধরতে। ঘটনাটি কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়, কেন না এই ঘটনায় যে উগ্র উলঙ্গ মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা ঔপনিবেশিক শাসনকালের একটি দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সমগ্র বঙ্গভূমিকেই আক্রান্ত করে রেখেছিল। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভালমানুষ সেজে বলতে শুনেছি এই দাঙ্গাটাঙ্গা 'ওরা' করে। এই 'ওরা' কারা? 'অশিক্ষিত' নিরক্ষর নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ। 'ওদের' কাঁধে দায় চাপিয়ে রেহাই পেতে চায়, পেয়েও যায়। ভালমানুষ কি ছিল না? ছিল। কিন্তু তারা নির্জীব, নির্বিকার ছিল, নির্ভীক ছিল না। সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধও ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক বাঙালি মধ্যবিত্তের সৃজনীশক্তি, কর্মশক্তি, প্রগতিপন্থী ভাবনাচিন্তা আমাদের চিরকাল দেশের একটি অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বদ্ধ করে রেখেছে, সারা দেশটাকে দেখতেই পাই নি। সামান্য আলোতে চমৎকৃত হয়েছি, সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত বিপুল অন্ধকার যে কত ভয়ংকর তা বুঝতেও পারি নি।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরাও আমাদের শুনিয়েছেন, মুসলমান সমাজে নারীনিগ্রহ - অশিক্ষা, কঠোর অবরোধ, তালাক — প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানের ঘরসংসারে নেই। এসব দুষ্ট রীতিনীতি প্রথা আছে 'ওদের' ঘরে। আবার সেই 'ওদের'! কিন্তু কথাটি একেবারে মিথ্যা। 'ওদের' নিয়ে আমরা কত যে মিথ্যার মিথ সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করতে চাই তার আর শেষ নেই। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বেশ কয়েকটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানের বাড়িতে আমি গেছি। মুর্শিদাবাদে আমার ছাত্র ইনসান আলি খান সম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান। ইনসান এখন বি ডি ও। তার বাবা দাদারাও সুশিক্ষিত। ইনসান যখন আমারই ছাত্রী বেবি ঘোষকে (বাবা-দাদার পছন্দ করা মুসলমান, দেখতে সুন্দর মেয়েকেও তার ভাল লাগে নি) বিয়ে করে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে আমি ওকে প্রশ্ন করেছিলাম,— বাবা-দাদাদের চটালে কেন? ও উত্তরে বলেছিল, 'স্যার ওদের বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ, ওই মেয়ে অ আ ক খ জানে কিনা সন্দেহ আছে, তাছাড়া ওদের নিয়মবিধি অনুযায়ী সারাদিন ও আমার সঙ্গে কথা বলবে না, আমার ধারেকাছেও আসবে না।' অথচ এই মেয়ের বাবা সরকারি স্কুল নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন-এর শিক্ষক, এক দাদা বহরমপুরে পোস্ট অফিসে কাজ করে। ইনসানের চেয়ে অনেক বেশি নামীদামি একজনের কথা বলি, তিনি ইসলামিয়া হাসপাতালের সার্জন অধ্যক্ষ ছিলেন — ড. গোলাম ইয়াজদানি — সি পি আই-এর এম এল এ-ও ছিলেন পাঁচ বছর। সিউড়ি শহরে তাঁর বাড়িতে (আমার ভিন্ন কাজের প্রয়োজনে) গিয়ে আমি হতবাক। মেয়েরা সব পর্দার আড়ালে। তাঁর তিন বোন কেউ লেখাপড়া শেখেনি। বড় মেয়ের বিয়ের চেষ্টা চলছে, বয়স তখন ষোল-সতের হতে পারে, বিদ্যাবুদ্ধি প্রাইমারি পাস। একজন ডাক্তারের বাড়ি এই দুর্দশার কারণ তো আর কিছুই না শুধু গোঁড়া ধর্মাচার। তিনিও কিন্তু দায় এড়ালেন নিজের বাবাকে দায়ী করে। অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী (পরে

প্রধানমন্ত্রীও) ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত (বরিশাল শহরে) সৈয়দেন্নুসা গার্লস স্কুলের মুসলমান মেয়েরা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেও বি এম কলেজের পথে পা বাড়াতে পারে নি — একজনও না। তারা তো সবাই উকিল-মোক্তার-শিক্ষক-ডাক্তারের মেয়ে ছিল। গ্রামের দিকে সে সময়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু বাড়ির ছবিও এর তুলনায় খুব বেশি উজ্জ্বল ছিল না। বহু মেয়েই ষষ্ঠ শ্রেণীর পর বেশিদূর এগোতে পারে নি। এই 'বহু' আমাদের দৃষ্টির বাইরেই থেকেছে। আমাদের গ্রামের (কীর্তিপাশা) ধোপার মেয়ে সত্যভামা দাস যখন বি এ পাস করলেন, তিনি তো দর্শনীয় 'জীব' হয়ে পড়লেন — ধোপার মেয়ে! বি এ পাস! যেন সর্বনাশ! তিনি এ জি বেঙ্গলে চাকরি করেছেন। অসাধারণ আবৃত্তি ও অভিনয় করতেন।

আমাদের পাশের গ্রামেই আর এক সত্যভামা ছিলেন — সত্যভামা চট্টোপাধ্যায়। অবস্থাপন্ন শিক্ষিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। হীরালাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছেলে গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়কে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছেন। কিন্তু মেয়েকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়েই বিয়ের হাঁড়িকাঠে বলি দিয়েছেন — লক্ষ্য স্ব-বর্ণে সুপাত্র। এমন বলি যে আমাদের বাড়িতেও হয়েছে। মা প্রতিবাদে দৃঢ় ছিলেন কিন্তু বাবার প্রতিবাদের ভাষায় তেমন জোর ছিল না বোধ হয়। গুরুজন আত্মীয়দের কাছে মাথা নুইয়েছেন। জীবনের বেশির ভাগটা বাইরে বাইরে ছিলেন, ইংরেজের জেলেও ছিলেন, মেয়েদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি, এই অপরাধবোধও ছিল। আমাদের বাড়িতে উচ্চশিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা? সেভেন-এইট, নাইন-টেনেই শেষ। এ রকম মধ্যবিত্ত বাড়ি হাজার-হাজার ছিল সারা বাংলাদেশে। পাঠকবৃন্দ প্রশ্ন করতে পারেন এ-সবের সঙ্গে ধর্মচেতনা অথবা ধর্মান্ধতার সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে। ধর্মচেতনা শুধু পূজাপাঠ, ব্রত-পার্বণেই আটকে থাকে না। মদের ফেনার মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে — আচার-বিচারে, প্রথাসিদ্ধ জীবনাচরণে, বসন-ভূষণে, ভোজনে, শয়নে, গমনে ভ্রমণে, গুরু ও গুরুজনদের প্রতি আনুগত্যে ও মান্যতায় অবিরাম ফোঁটায় ফোঁটায় চুয়ে পড়তেই থাকে, এর থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। উপায় কেউ খোঁজেও না। এই তো ভালো, এমন ভাবভঙ্গিতেই জীবন কেটে যায়।

আমি যাদের কথা বললাম তারা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত;শিক্ষিত, উচ্চবর্ণজাত, সমাজে সাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত সম্মানিতও। সুতরাং বারবার চোখে খোঁচা দিয়ে ওই 'ওদের' দিকে আঙুল তুলে দেখালেই নিজেদের ধর্মান্ধতার অন্ধকার কাটে না, কাটে নি, কাটবেও না কোনোকালে। ওরা অশিক্ষিত নিরক্ষর, ওরা ধর্মান্ধ, আমরা শিক্ষিত, ধর্মান্ধ নই, আমরা ধর্মপ্রাণ, যত হানাহানি মারামারির সমস্যা-সংকট 'ওদের' নিয়ে, আমরা সব সাধুপুরুষ এমন অভিমান এক কথায় মিথ্যা, ভণ্ডামিও বলা যায়।

এমন কথাও বলতে শুনি — 'ওরা' তো ধর্মান্ধ হবেই, 'ওরা' অজ্ঞ অজ্ঞান, শিক্ষা বা জ্ঞানের আলো পায়নি। 'পায় নি' না আমরা দিতে চাই নি, তা একবারও ভেবে দেখিনি। তাছাড়া আলো দিতে পারি, এমন আলো কি অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চরিত্রে আছে? নেই। অন্ধ আবার অন্ধকে পথ দেখাবে কী করে? পথ দেখাতে গিয়ে পাঁজিপুঁথি শাস্ত্রসংহিতার অন্ধগলিতেই টেনে নিয়ে যাব।

ধর্মান্ধতার দুটি দিক, একেবারে বিপরীত। একটি ভীরুতা অন্যটি উগ্রতা (হিংস্রতাও বলা যায়)। ভীরুতা চরিত্রে আনে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ, জীবনে পচন ধরায়। উগ্রতা আনে হিংসা ঘৃণা ও বিদ্বেষ। স্বার্থান্বেষীরা, ক্ষমতালোভীরা এই দুটিকেই কাজে লাগায়। ১৯৪৬-৪৭-এর কলকাতা, নোয়াখালি বিহারের দাঙ্গা, ভাঙা এই দেশ প্রভৃতি ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় ধর্মান্ধতার কালো কালিতেই লেখা হয়েছে। ধর্মান্ধতাই এদেশে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল ধরে হানাহানি মারামারির প্রধান কারণ। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের 'সমষ্টিশক্তি' অনেকটা কবন্ধের মতো, মস্তিষ্কবিহীন সুতরাং বুদ্ধি বিবেচনা কিছুমাত্র থাকে না। একজন হিন্দু অথবা একজন মুসলমান যখন স্বতন্ত্র, যখন শুধু ব্যক্তি তখন তার ধর্মান্ধতা তার নিজের ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকে বউ-ছেলেমেয়েদের সে ধর্মের বেড়াজালে বেঁধে রাখে, অন্যকে আক্রমণ করার সাহস পায় না। এমন কী তার অন্তর্লীন সুপ্ত বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠতেও পারে। এসব মানুষ — হিন্দু-মুসলমান— আমি দেখেছি। কিন্তু এই মানুষটি সমষ্টির মধ্যে ঢুকে পড়লেই কবন্ধ শক্তিতে বিলীন হয়ে যায়, মানুষের মুখটি আর দেখা যায় না।

এক একটি মঠ-মন্দির পীঠস্থান নিয়ে উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ বাঙালি মধ্যবিত্তের মাতামাতি আমি দেখেছি। এরা অনেকেই দেশবিদেশের সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস পাঠ করেন, কেউ কেউ তো এসব বিষয়ে শিক্ষকতাও করেন, অথচ জীবনাচরণে কিছুমাত্র তাদের ভাবনা চিন্তাকে আলোড়িত করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' পড়াতেন তাঁকেই দেখা যেত স্থিরকালের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে আছেন। ঘরে ফেরার পথে কালীঘাটের মন্দিরে ডালি রেখে যেতেন।

বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত মধ্যবিত্ত বাঙালি পণ্ডিত ব্যক্তির নাম করা যায় যাঁরা কর্মসূত্রে কলকাতা, পাটনা এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে বাস করতেন, তাঁদের জন্মভিটে ছিল গ্রামে গঞ্জে, মহকুমা অথবা জেলা শহরে। দুর্গোৎসব থেকে আরম্ভ করে দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, রথযাত্রা, লক্ষ্মী-মহালক্ষ্মী পূজা, কালী মনসা-শীতলার পূজা প্রভৃতি নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হত তাঁদের বাড়িতে। তাঁরা ছুটিছাটায় এসে এসব অনুষ্ঠানে যোগও

দিতেন। (প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যাঁর পাণ্ডিত্যকে রবীন্দ্রনাথও সমীহ করতেন), যৌবনে গৈলা গ্রামের নিজের বাড়িতেই সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শন পঠনপাঠনের জন্য 'কবীন্দ্র কলেজ' স্থাপন করেছিলেন, তিনিই এই কলেজের পেছনে মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত স্মরণে মনসা মন্দির গড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর আগে, দেশভাগের কিছুকাল পরেই কবীন্দ্র কলেজ উঠে যায়, কিন্তু মনসামন্দিরটি এখনও আছে। এঁদের অনেকের বাড়িতেই আমি দেখেছি দুর্গামণ্ডপের অদূরেই আছে দোল উৎসব পালনের ঢিপি, মনসা কালীর থান, শীতলা খোলা। শুনেছি ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্রথম সাতদিন ধরে মনসার ভাসানগান আবার পরের সাতদিন ধরে পালাকীর্তন। এসব উৎসব-অনুষ্ঠানে উচ্চবর্ণেরই প্রবেশাধিকার, ধোপা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের দেখেছি ভিক্ষার মতো 'প্রসাদ' পাওয়ার জন্য দূরে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ণবিদ্বেষ যে ধর্মান্ধতারই একটা দিক, তা ভুলতে পারি না।

প্রসঙ্গত আরও দু-একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির নাম স্মরণ করছি — ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন, শিক্ষাব্রতী তটিনী গুপ্ত (পরে দাশ), নন্দনতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বখ্যাত বিশিষ্ট আইনজ্ঞ রাধাবিনোদ পাল (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন) তাঁদের সবারই গ্রামের বাড়িতে ধর্মাচরণের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল যুক্তিহীন বিবিধ আচারবিচার। তাঁরা কতটা ধর্মান্ধ ছিলেন জানি না কিন্তু বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদীও ছিলেন না। গ্রামের বাড়িতে তাঁরা নানা আচারসর্বস্ব ধর্মোৎসবে উপস্থিত থাকতেন। যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের অথবা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ধর্মীয় মানসিকতা অনুধাবন করতে তাঁদের কথা বলতেই হল।

চার

আমি সংক্ষেপে ঔপনিবেশিক শাসনের যে যুগের কথা এতক্ষণ বললাম সেই যুগে কলকাতা শহরের শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি কি দু'চার ধাপ মুক্তবুদ্ধি জীবনধারার দিকে এগিয়ে ছিল? না। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার এবং নানা সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা শহর। কত বই, কত পত্রপত্রিকা কত সাহিত্যসভা, কত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কত মিছিল-জনসভা, কত 'বৈপ্লবিক' স্লোগান! কিন্তু এর পাশাপাশি ভাবুন কত ধর্মের বই ও পত্রপত্রিকা, ধর্মসভা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, মঠে মন্দিরে তন্ত্রমন্ত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যার আসর, কত নামকীর্তন। মধ্যবিত্ত বাঙালি সংখ্যাধিক্যে দড়ি টানাটানিতে প্রথম পক্ষকে অনায়াসে পরাভূত করে দিতে পারত। শুধু এখন নয় তখনও কলকাতা শহরের অসংখ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মানত করা পাঁঠা বলি দিয়ে আসতেন, গুরুজি, বাবাজিদের আশ্রমের সামনে ক্ষণেকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন — নারী পুরুষ দুই ভিন্ন সারিতে — তাঁরা কেউ নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন ছিলেন না। অনেকেই তো দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে সারির পেছনে এসে দাঁড়াতেন, তাঁদের শহরের অভিজাত এলাকায় বহুতল ভবনও ছিল। কেন আসতেন তাঁরা? আসতেন যুক্তিবুদ্ধি হীন বিশ্বাসের টানে — এরই নাম ধর্মান্ধতা, বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকৃত ধর্মচেতনা। কলকাতা শহরের জনপথে,, অলিগলিতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্কুল কলেজ হাসপাতালের সীমানার ভেতরেও ছোটবড় মন্দির বা পাথুরে দেবস্থানের সংখ্যা তো ছিল অগণ্য, বারোয়ারি পুজার মাতামাতি তখনও ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রধান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ঊনিশ শতকের বাঙালি বাবু-কালচারে ছিল ধর্মাচারের সঙ্গে ব্যভিচার অথবা ব্যভিচারের সঙ্গে ধর্মচার। আর বিশ শতকের কয়েক দশক ধরে ধর্মাচারে মিশেছে ভ্রষ্টাচার ও অশিষ্টাচার।

পাঁচ

সমসময়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কলকাতা অথবা ঢাকার মতো শহরেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাবিপুল ছিল না। মুসলমানদের তুলনায় খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ (বাংলাদেশে তাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অনেক বেশি ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত ছিল। খ্রিস্টান মধ্যবিত্ত বাঙালি বড়দিনের উৎসবে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করত না (এখন অবশ্য নাচ-গান-পানের আতিশয্য দেখা যায়, তার মধ্যে কিন্তু ধর্ম নেই, আছে সংযম ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব)। খ্রিস্টান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি প্রত্যেকে প্রতি রবিবারে চার্চেও প্রার্থনা করতে যেত না। তারা যে খ্রিস্টান তা অনেক সময়ে বোঝাও যেত না। ধর্মভক্তি অর্থাৎ যিশুভক্তির চেয়ে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজ-সান্নিধ্য লাভে চাকরি, পদোন্নতি, প্রতিষ্ঠা, সুযোগসুবিধা ভোগ এগুলিই বেশি কাজ করত। ধর্মান্তরিত হয়ে তারা ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে ব্যবহার করত বলে আমার মনে হয় না। (উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে মুর্শিদাবাদে আমার কয়েকজন খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রী ছিল - সুকুমার, দীপ্তিকুমার, সাধন সিক্তা, প্রতিমা প্রভৃতি। তাদের নাম, উপনাম আচারআচরণে ওদের খ্রিস্টান বলে কখনও মনে হয় নি। ওদের বাবা-মাকেও সাধারণ বাঙালি বলেই মনে হয়েছে। খ্রিস্টান ভাবের ছায়ামাত্র দেখিনি)। তবে হ্যাঁ, মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' (Saint) বানাতে বাঙালি মধ্যবিত্ত খ্রিস্টানদেরও যে উন্মাদনা ও উদ্দীপনা দেখেছি, তাকে ধর্মান্ধতা বলতে হবে।

বৌদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্তরা (সংখ্যায় অতি অল্প) অধিকাংশই ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। যে কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মঠে অথবা

আশ্রমে যেতেন তাঁরা বোধ করি ধর্মাচরণে গোঁড়া ছিলেন, এখনও তাই। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাদবাকিরা জীবনাচরণে ধর্মাচরণকে একাত্ম করে নেয় নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বৌদ্ধ দর্শনে সুপণ্ডিত বেণীমাধব বড়ুয়া বৌদ্ধ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পালি পড়াতেন অধ্যাপক কে কে বড়ুয়া, বরিশাল শহরে জীবনানন্দের প্রতিবেশী ছিলেন তাঁর সহকর্মী ইতিহাসের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া — নদীর ধারে একসঙ্গে বেড়াতেন বিকেলে, সন্ধ্যায়। তাঁরাও বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের ভাবে-স্বভাবে ধর্মের ছাপ খুঁজে পাওয়া যেত না। আমার সহপাঠী বৌদ্ধ বন্ধু ছিল গৌরহরি বড়ুয়া (নামটি লক্ষণীয়, ধর্ম সমন্বয় !) শান্ত স্বভাবের মানুষ। এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টাফরুম-সংলগ্ন টি রুমে আছে সুনীল বড়ুয়া। ছাত্ররা জানেও না তাদের সুনীলদা বৌদ্ধ ।

তুলনামূলক বিচারে ঔপনিবেশিক পর্বে মুসলমান সমাজে ধর্মান্ধতা ছিল অনেক বেশি উগ্র। যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান তারাও ধর্মান্ধতা-মুক্ত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় মুসলমান বুদ্ধিজীবী 'শিখা' আন্দোলনে মুক্তবুদ্ধি জীবনাদর্শ প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার বিরোধিতা শুধু ঢাকার নবাব করেন নি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালিরাও 'শিখা' আন্দোলনের সোচ্চার প্রতিবাদী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই মুক্তবুদ্ধি মুসলমান যুবগোষ্ঠির 'ধর্মবিদ্বেষী' আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র এসেছে বহুবার, কমপক্ষে দশবার। ঢাকার ঝুলনযাত্রার দিনে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল 'বার্ষিক' ঘটনা, যেন দাঙ্গা একটি অবশ্য পালনীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। হিন্দুরাও ধোয়াতুলসী পাতা ছিল না। দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তরাও এই বার্ষিক দাঙ্গায় প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে অংশগ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন না।

ছয়

এবার দেখা যাক উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গে যুক্তিবুদ্ধিহীন ধর্মচেতনা অর্থাৎ ধর্মান্ধতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আলোর দিকে কতটা পথ পার হয়ে এসেছি। এক মিটারও নয়। সন্দেহ নেই দৃশ্যপটের বিস্তর বদল হয়েছে। জীবনযাত্রায় আধুনিকতা অর্থাৎ modernity অর্থে (modernism নয়) এসেছে। শুধু কলকাতা শহরেই নয়, জেলা শহরে, মহকুমা শহরে, আধা শহরে, এমন কি গ্রামগঞ্জেও বহুতল বাড়ি উঠেছে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হতে হতে একটার পর একটা রাস্তার আধখানা গিলে খেয়েছে। যুক্তিবুদ্ধির আলো নাই বা থাকল, বৈদ্যুতিক আলোর মালায় শহরগুলি ঝকমক করছে। গাড়ির সংখ্যা পিঁপড়ের সারিকেও হার মানায়। প্রাইভেট, ট্যাক্সি, মিনি, সরকারি বেসরকারি বাস, অটো, স্কুটার, সি টি সি, মন্থরগতি ট্রাম, মাটির তলায় দ্রুতগতি মেট্রো ট্রেন, গঙ্গার বুকে লঞ্চ ইত্যাদি নানাবিধ যান-ব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাফে, বার, বিউটি পার্লার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বিপুলাকার শো-রুম, সুপার মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট ইত্যাদি নিয়ে বড়-ছোট শহরগুলি ধনসম্পদের অহংকারে ফেটে পড়ছে। দেখে মনে হবে না, অভুক্ত অপুষ্ট মানুষদের কোনো গ্রাম, ঝুপড়ি, বস্তি এই রাজ্যে কোথাও আছে। এর সঙ্গে আছে মনীষীদের নামে নামে অসংখ্য ভবন, সদন, (তাঁদের স্মৃতিরক্ষায় আমরা যতটা তৎপর, সৃষ্টি রক্ষায় অর্থাৎ চর্চায় ততটাই নিরুদ্যম), আছে নন্দন, সায়েন্স সিটি, মিলেনিয়াম পার্ক, লবণ হ্রদ স্টেডিয়াম, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, আরও কত সব — তালিকা দীর্ঘ করতে চাই না। এ সব কিছুই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য (মধ্যবিত্তদের একটি অংশ, ক্ষুদ্রাংশ হলেও, উচ্চবিত্ত স্তরে উঠে এসেছে)। যে দৃশ্যপটের কথা বলছিলাম তা এখন রঙে রঙে, রঙের বাহারে ঝলমল করছে, সন্দেহ নেই। স্কুল কলেজ (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল সহ), বিশ্ববিদ্যালয় এখন সংখ্যা গণনার বাইরে। আছে ম্যানেজমেন্ট কোর্স, কম্প্যুটার কোর্স-এর কত শত প্রতিষ্ঠান। এই বাড়বাড়ন্তের পাশাপাশি আরও নানা বাড়বাড়ন্তের কথাই এই নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক।

(ক) বামনবুদ্ধি, ধর্মান্ধ শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্তের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি কোনো বিষয়ের চর্চায় তারা আর মনোনিবেশ করতে চায় না, পারেও না। সাহিত্য তারা গলাধঃকরণ করে, অনুধ্যান ও অনুধাবনে উৎসাহী নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে একাল পর্যন্ত সাহিত্য পাঠে প্রকৃত মনোযোগী হলে তাদের ধর্মান্ধতা কিছুটা ঘুচে যেতে পারত। যারা রাজনীতির জগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ আ ক খ জানে না, জানবার আগ্রহও নেই। অর্থনীতি না বুঝেই অর্থনৈতিক প্রকল্প-পরিকল্পনায় ফাঁপা মাথাটি গলায়। তারা যে মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ সে সমাজের ধর্মান্ধতা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার এখনও বিশ্বাস এক সময়ে অন্তত দু-চারজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ছিলেন যাঁরা ধর্মান্ধতার বাইরে এসে সত্যকে খুঁজতেন। তাঁরা এখন বিরল প্রজাতির মতোই অবলুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়।

(খ) বাড়ছে প্রায় তিনগুণ সংখ্যক ছোট-বড় নানা দেবতার মন্দির। এর মধ্যে শণি ঠাকুরেরই প্রাধান্য। শিব, গণেশ, কালী, মনসা, সন্তোষী মা, হনুমানও আছে। কলকাতা এবং অন্যান্য শহরের অলিগলিতে শুধু নয়, প্রশস্ত ব্যস্ত রাস্তারও পাশে, এখানে, সেখানে মোড়ে মোড়ে শনি মন্দির দেখা যাবেই। আমার ধারণা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো রেলস্টেশন নেই যার কাছাকাছি, যাতায়াতের পথে এমন একটা মন্দির দেখা যাবে না। শনিমন্দির হলে সন্ধ্যা থেকে যাদের ভিড় সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারা অবিমিশ্র মধ্যবিত্ত, কেতাদুরস্ত আধুনিক মধ্যবিত্ত — চালচলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে। অথচ স্বভাবের গভীরে ধর্মান্ধতার বিষাক্ত

বিছেটিকে তারা লালন করছে।

আমি বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত চন্দননগরের ছাত্রদের নিয়ে একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা করেছিলাম। মাত্র দশ পনেরো বছরের মধ্যে চন্দননগর, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর — এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেবতার ঢিবি বা মন্দিরের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ — ছোট-বড় নিয়ে। এখানে যারা নিত্য দেব দর্শনে আসে তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা — স্কুল-কলেজে পড়ছে কিশোরী, যুবতীরাও থাকে। যে কেউ যে কোনো দিন এসে দেখে যেতে পারেন।

(গ) কোন্নগরের শকুন্তলা (শকুন্তলা নয়) কালীপূজা সারা হুগলি জেলায় খ্যাতি পেয়েছে। এখানে পূজা উপলক্ষে সারাদিন গঙ্গাস্নান চলে। প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ভিজে কাপড়ে ধুলোমাটি মাখতে মাখতে মন্দির পর্যন্ত যারা আসে তারাও শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রগতিবাদী মধ্যবিত্ত ঘরের বউ-মেয়েরা। সারারাত ধরে হাজারের ওপর পাঁঠাবলিকে ঘিরে এখানে যে মাতলামি হয়, তা একটি সভ্যদেশে অকল্পনীয়। অথচ হয়ে আসছে বছরের পর বছর। আমরা এর বিরুদ্ধে বহুবার অবস্থান-প্রতিবাদ জানিয়েছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই অসভ্যতা বন্ধ করার জন্য আবেদন নিবেদন করেছি, সভাসমিতি মিছিল করেছি, পুস্তিকা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। কোনো কাজ হয় নি। স্থানীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা ভয়ে অথবা কী কারণে জানি না এই বর্বরোচিত বার্ষিক অনুষ্ঠানটিকে নিশ্চিত এবং অব্যাহতই রাখতে চেয়েছেন। কারণটা যে ধর্মান্ধ মনের 'দুর্জয়' ভীরুতা, সহজেই অনুমেয়।

(ঘ) বেড়েছে গ্রহরত্নের ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী বা হস্তরেখা বিশারদের সংখ্যা। রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে নারীপুরুষের আঙুলের দিকে চেয়ে থাকা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শতকরা ৯৫ জনের আঙুলে আঙুলে দেখেছি তিন, চার এমন কি পাঁচটি আংটিও — পাথরখচিত। মেয়েদের সোনার আংটি না হয় অলংকার, কিন্তু পাথরগুলি? পুরুষেরাই বা কেন এত আংটি পরে নির্বোধ সাজে? জানি, জ্যোতিষীর বিধানে অথবা গুরুজি, বাবাজি, মাতাজির নির্দেশে। আমাদের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন সৌরভ গাঙ্গুলির পোশাকের আড়ালে ঝুলন্ত মাদুলি একদিন দূরদর্শনের আনুকূল্যে দৃশ্যমান হয়ে পড়েছিল, কদিন আগে শনিমন্দিরে মাথা ঠুকতেও দেখলাম। তার সহধর্মিনীকে দেখা গেল ইসকন-এর রথের পথে ঝাঁটা হাতে। চমকে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য মহোদয়ের ডান হাতে পাথর-খচিত আংটি দেখে। আমাদের বাড়িতে এক মহিলা আসেন, তিনি সি পি এম-এর সক্রিয় কর্মী। তার হাতের আঙুলে পলা-নীলা-খচিত আংটি তিন চারটে। বহু বিপ্লবী ও প্রগতিপন্থী ব্যক্তি গলায় পৈতে ঝোলান। আগে খোলামেলা ছিল। এখন ঝুলছে পোশাকের আড়ালে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের ধর্মান্ধতার এক ধরনের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এঁদের ধর্মান্ধতার ব্যাখ্যা কী? সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে মাতামাতি তো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই করে থাকে (সরকারি-বেসরকারি দুই মহলেই)। সাধারণ মানুষ এঁদের ধর্মাচরণে সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন) জ্যোতি বসুর স্ত্রী তারকেশ্বর মন্দিরে (ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট যাত্রী শূন্য করে) পূজা দিতে গেলে সেই 'ওদের' আমরা কোন মুখে নিন্দা করব?

(ঙ) বেড়েছে এবং দিনে দিনে বাড়ছে ধর্মমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে সস্তা ধরনের বই, পত্রপত্রিকা — হাজার হাজার। এদের অনুরাগী পাঠককুল শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত।

জনৈক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) বৈদ্যুতীন সরঞ্জাম সজ্জিত ফ্ল্যাট থেকে 'বৈভবলক্ষ্মীব্রত' নামের ছোটো বইখানি সংগ্রহ করেছি। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে ফেরত দিতে হবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। বইখানি তাঁর মা, বিধবা দিদি এবং স্ত্রীর 'অমূল্য' ধন। এঁদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বহুদিনের, সে কারণে আমি লজ্জিত। এর আর একটি কপি পেতে অসুবিধে নেই, এর হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। কিন্তু ওঁদের এইটিই চাই, কারণ এই কপিটি তাঁর স্ত্রীর কাছে অজ্ঞাত অদৃশ্য উৎস থেকে উড়ে এসেছে। ধর্মপ্রাণ নারী অথবা পুরুষ এভাবেই নাকি বইখানি পেয়ে যায়। আমি জোর করেই নিয়ে এসেছি। অধ্যাপক আমাকে বললেন, 'তোমার কোনো প্রাপ্তিযোগ নেই, তুমি তো অবিশ্বাসী। আমার মা'র কিন্তু বাতের যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেছে, আমার জীবনেও এখন কোনো সমস্যা সংকট নেই।' এ কথাও বললেন, 'কলকাতা শহরে বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ মধ্যবিত্তের (ডাক্তার, অধ্যাপক, গবেষক, সরকারি আমলা প্রভৃতিও আছেন) ঘরে তুমি বইখানি পেয়ে যাবে।'

বইখানিতে বিপদ বাধাবিঘ্ন থেকে উদ্ধারের কয়েকটি 'অসাধারণ' গল্পকথা আছে। একটি এখানে উদ্ধৃত হল (বানান ও ছাপার ভুল সহ)

লটারিতে অর্থলাভ

আমি গরিব ছিলাম। আমার স্বামী পঙ্গু ও অসুস্থ ছিলেন। দুইটি ছোট ছেলে। জ্যেষ্ঠা কন্যা ডাক বিভাগে চাকরী করত। তাহারই বেতনে সংসার চলিত। দেখিতে দেখিতে কন্যার বয়স পঁচিশ পার হইয়া গেল। সেই কারণে আমরা তাহার বিবাহের চিন্তায় ছিলাম। সুযোগবশত একটি ভালো ছেলেও পাইয়া গেলাম। ছেলেরও মেয়েকে পছন্দ আর মেয়েরও ছেলেকে পছন্দ। বিবাহের তারিখও ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু সেই সময় আসিল এক বাধা। ছেলের মা বলিলেন, 'যতই সাদাসিদা ভাবে বিবাহ হউক, মেয়েকে ১০০ গ্রাম সোনার গহনা অবস্যই দিতে হইবে। তবেই এই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। নচেৎ আমি সম্মতি দেব না। আমাদের

অবস্থা চিন্তাজনক হইয়া উঠিল। মনে হইল নদীর কিনারায় নৌকা আসিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। সঞ্চয় কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ১০০ গ্রাম সোনা কোথায় পাইব।

আমি উদাস হইয়া দাঁরাইয়া ছিলাম। তখনই বাইরে একটি মটর সাইকেল বেগের গতিতে পার হইয়া গেল। আমি দেখিলাম মোটর সাইকেল হইতে কি যেন হাওয়াতে উড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। কৌতুহল মনে তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখিলাম যে সেটি একটি 'বৈভবলক্ষ্মীর ব্রতের' পুস্তক। আমি শাড়ীর আঁচল দিয়ে পুস্তকটি পরিষ্কার করিয়া চোখেতে দেখলাম এবং পড়িতে বসিলাম। পড়িতে পড়িতে মনে হইল যে যদি আমিও এই বৈভবলক্ষ্মীর ব্রত করি তবে আমারও বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। মনে হইল মা আমাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই এই পুস্তকটি এইভাবে আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব উদয় হইল।

পরের দিন শুক্রবার ছিল। আমি স্নান করিয়া ১১টি শুক্রবারে ব্রত করিবার মনস্থ করিলাম। পুস্তকে বর্ণিত বিধি অনুসারে ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত বিধিমত পুজা করিয়া সন্ধায় চালের মণ্ডপের উপরে তামার জল পূর্ণ ঘট রাখিয়া তাহার উপর বাটির (ঢাকনা) উপর আমার হাতের সোনার আংটি রাখিলাম। পুস্তকে লিখিত বিধি অনুসারে পুজা করিয়া গুড়ের প্রসাদ নিবেদন করিলাম।

রাতদিন আমার ধ্যান 'ধনলক্ষ্মী ছবিতে' নিবদ্ধ থাকিত। আমি প্রতিদিন তাহার দর্শন করিবার কাতরভাবে প্রার্থনা করিতাম। পাঁচ দিনের দিন আমি সন্ধ্যায় 'ধনলক্ষ্মীর' মার ছবি দর্শন করিয়া পুজায় বসিয়াছি সেই সময়ে আমার ১৫ বছরের পুত্র দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল মা! আমাদের মহারাষ্ট্রের লটারী লাগিয়াছে আমরা পুরা পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরষ্কার পাইব।

আমি আনন্দে উৎফুল্লীত হইয়া উঠিলাম। পুত্রকে বলিলাম, তুই একটু দাঁড়া। আমি পুজা সারিয়া, প্রসাদ লইয়া পরে কথা বলিব। আমি আনন্দের সহিত ব্রতবিধি শেষ করিলাম এবং সকলে মায়ের প্রসাদ খুব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলাম। পরে লটারীর টিকিটের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ওর কথা সত্য। মা আমার দুঃখ দূর করিয়া দিলেন। আমি লটারির টাকা পাইতেই সেই টাকা দিয়া মেয়ের জন্য ১০০ গ্রাম সোনার গহনা তৈয়ারী করাইয়া মেয়ের বিবাহ দিলাম। কন্যাকে গহনা দিয়া শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইলাম। এইভাবে 'বৈভবলক্ষ্মী মায়ের' ব্রতের প্রভাবে ধনলক্ষ্মীমা আমার দুঃখ দূর করিয়া দিলেন। 'জয় ধনলক্ষ্মীমা!'

ধর্মান্ধতা যে মানুষকে (উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেও) কতটা বোধবুদ্ধি হীন ও চেতনাশূন্য করে দিতে পারে এই পুস্তিকাটি তার নিদর্শন। (যাদের আমরা অশিক্ষিত মনে করি, উপেক্ষাও করি ধর্মান্ধতা তাদেরও আছে কিন্তু তাদের এমন ভণ্ডামি অথবা শিক্ষার অভিমান নেই।)

আর একটি বিষয় এই গল্পকথায় লক্ষণীয়। এখানে সমস্যা হল ১০০ গ্রাম সোনার, যা বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষকে দিতেই হবে। ধর্মান্ধতা ও 'যৌতুক' প্রথার সামাজিক ব্যাধিটি এখানে মিলেমিশে আছে।

সবশেষে এ কথাটি জানা গেল যে, অধিকাংশ বাঙালি মধ্যবিত্তই পরাধীন থাকতে ভালবাসে। প্রায় দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীনতাকে ভালবাসা মধ্যবিত্তের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। কোনো একটি শক্তির (দেবতা, অবতার, ধর্ম, ধর্মগুরু নেতা অথবা দানব) অধীনতাতেই সে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখবার মতো — এই যে দু দিকেই এত বাড়বাড়ন্ত গতি — ঊর্ধ্ব এবং অধঃ — এর কোনোটির সঙ্গে নিম্নবর্গীয় 'ওদের' যোগ নেই। আগেই বলেছি 'ওদের' ধর্মান্ধতা আছে, এই ধর্মান্ধতা দূর করতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের যে ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল, সে ভূমিকায় তারা নামতে চায় নি। বিপরীত কাজটাই করছে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র বারোয়ারি ধর্মান্ধতায় নাচন-মাতনে 'ওদের' ধর্মান্ধতাকেও জীয়ন্ত রেখেছে। আমরা ভণ্ড এবং ভীরু মধ্যবিত্তরা 'ওদের' জীবনভূমিতে এক ফালি রোদও ফেলতে পারিনি। শুধু আমাদের প্রাণে এই আশঙ্কাটুকু যেন থাকে — ইতিহাস ক্ষমাহীন।

নিবন্ধের 'এবং ...' পর্যায়ে আমার কৈফিয়ত সম্পাদক এবং পাঠকবৃন্দের কাছে :

(ক) আমার এই নিবন্ধে কোনো পণ্ডিত লেখক অথবা ভাবুকের উক্তি উদ্ধৃত হয়নি, সে সুযোগ বা ফাঁকটুকুও ছিল না। আমি আমার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, সেখানে কোনো ফাঁকি নেই।

(খ) নিবন্ধে নেতিবাচক দিকটিই নিশ্চয় প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা স্বেচ্ছামূলক। সক্রেটিস (এই প্রথম নিবন্ধে এক অবিস্মরণীয় মনীষীর নাম উচ্চারণ করলাম) বলতেন মন্দকে আঘাত করতে হলে মন্দ গল্পকথাই বেশি করে বলবে। ভাল যা তা তো ভাল আছেই, ভাল অব্যয় অক্ষয়। এই নিবন্ধেও আমি মন্দকথাই বেশি বলেছি।

—অবভাস অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত

বাংলায় নদীর সঙ্কট ও প্রতিকার প্রচেষ্টা

১৮শ শতক - ১৯শ শতক

সৌমিত্র শ্রীমানী

বিগত কয়েক শতক ধরে ভারতের প্রধান নদীগুলির অধিকাংশই বার বা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এই সব নদীর মধ্যে ভাগীরথী-হুগলী অন্যতম। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের পাশাপাশি ছিল নদী ভাঙনের সমস্যা, যার হাত থেকে বর্তমান কালেও আমরা মুক্ত নই। নদীর এই জাতীয় সমস্যা প্রতিরোধের জন্য সাধারণভাবে মানুষ নদীর তীর ধরে বাঁধ নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করে। অনেকের মতে 'বাংলা' বা 'বঙ্গাল' এই শব্দের জন্মই হয়েছে তার আদি নাম বঙ্গর সঙ্গে 'আল' (অর্থাৎ বাঁধ) শব্দের সন্ধির ফলে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বহুকাল পূর্বেই নদীতে বাঁধ দেওয়ার কৌশল রপ্ত করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে বাংলার পশ্চিমাংশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এসে পৌঁছয় পূর্বের অনুপাতে বহুকাল পূর্বে। ফলে কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষার জন্য তার চারপাশ ঘিরে বাঁধ অর্থাৎ আল দেওয়ার কৌশলও তারা শিখেছিল একই সময়ে। আমরা এই কৌশলকেই নদীর জল নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত।

বর্ষার মোটামুটি তিনমাস ভাগীরথী-হুগলীর (যাকে বাংলায় গঙ্গা নামেই ডাকা হয়) রূপ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। প্রথমত হিমালয় অঞ্চলে নদীর উৎসমুখে প্রবল বৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত গ্রীষ্মের তাপে হিমালয়ের তুষারের গলন — এই দুইয়ে মিলে অকস্মাৎ নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপেও পৃথিবীর মধ্যে এর থেকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এসবের মিলিত কারণে ভাগীরথী-হুগলী তথা তার শাখানদীগুলিতে জলের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে তা নদী বহন করতে পারে না। বার্ষিক বন্যা হল তাই এক সাধারণ ঘটনা। বলাই বাহুল্য যে, নদীতীরবর্তী মানুষ ধন-প্রাণ বাঁচাতে নিজেরাই নদীবাঁধ দিতে শুরু করেছিল। এভাবেই তারা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। আবুল ফজল ষোড়শ শতকের শেষদিকে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়ার সময়ে লিখেছেন, শহরের পূর্বদিকের অংশ যথেষ্ট নীচু এবং তা এক জলাভূমি। যার তিনি নামকরণ করেছিলেন 'ছুটিয়া পটিয়া'। গৌড় একদিকে গঙ্গা ও অন্যদিকে মহানন্দা নদীকে নিয়ে অবস্থিত। নদীতে জল বৃদ্ধি পেলেই তা শহরে প্রবেশ করত এবং ঐ জলাভূমিতে গিয়ে জমা হত। ভাঁটার টান এলে এবং শহরের নিকাশী জল বেরনোর সময় নালার মাধ্যমে সেই জল পুনরায় 'ছুটিয়া পটিয়া'-তে গিয়ে জমা হত। এ জাতীয় দৃশ্য আবুল ফজল অন্যত্র কোথাও দেখেছেন বা শুনেছেন বলে জানা নেই।

বাংলায় নদীবাঁধ নির্মাণ তথা নদীর স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে ষোড়শ শতক থেকে বেশ কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। নদী এবং খাল প্রভৃতির মতো জলপ্রবাহের তীর বাঁধানো এবং তাদের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুঘল প্রশাসন স্থানীয় জমিদারদের নিয়মিত 'জলবন্দী' খাতে রাজস্বে ছাড় দিত। প্রশাসন ভালই জানত যে, নদীর প্লাবনে ভূমিক্ষয়ের অর্থ রাজস্বের ক্ষতি। কার্যত এভাবেই সমগ্র গঙ্গানদীর দুই তীর বাঁধানো ছিল। ১৬৬০-এর দশকে ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাই লিখেছেন, রাজমহল থেকে সাগর পর্যন্ত গঙ্গা নদী নেহাতই এক খাল, নদী কোনোভাবেই নয়। প্রধানত মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার অঞ্চলে ভাগীরথীকে দেখেই বার্নিয়ের তাঁর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কারণ ভগবানগোলা থেকে পলাশী, দীর্ঘ ৫৭ মাইল নদীতীরের পুরোটাই দু'দিকে বাঁধানো ছিল। ঠিক এমনই কথা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন স্যার উইলিয়াম উইলকক্স। তাঁর মতে, খালের জলে সেচের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যেই প্রাচীনকালের হিন্দু রাজারা এই দীর্ঘ খাল খনন করিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার, ভাগীরথী যেমন হিমালয় হতে বাহিত হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ফলে মাটি ও বালুকণা বহন করে আনে তেমনি প্রতিদিন সমুদ্রের জোয়ারের পর ভাটার সময়ে রেখে যায় সমুদ্রজাত বালুকণা। এভাবেই প্রতিদিন নদীগর্ভে সঞ্চিত হয় বিপুল পরিমাণে পলি ও বালুকণা। নদীগর্ভের উচ্চতা যায় বেড়ে এবং জল ধারণের ক্ষমতা যায় কমে। ফলে প্রবল বর্ষণে জলধারার পরিমাণ অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেলে তা ধারণের ক্ষমতা নদীর থাকে না। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি এমনই যে, সে নদীর স্ফীতধারাকে ধরে রাখতে অক্ষম। ফলে বন্যার সম্ভাবনা ও প্রকোপ দুটোই বেশি। সেই সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেতেই নদীতীরবর্তী মানুষ প্রতিনিয়ত নদীর তীরকে বাঁধিয়ে তাকে রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু নদী তার দুই তীর ভাঙার কাজ কোনো সময়ে স্থগিত না করায় নদীতীরবর্তী অধিবাসীদের সর্বদা নদীর তীরকে রক্ষা করতেই হত। একই সঙ্গে বার্ষিক বন্যাজনিত জলস্রোতকেও সেচের কাজে ব্যবহারের ঐতিহ্য তারা গড়ে তোলে।

সেচের কাজে জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই কিন্তু নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, শুক্‌নো মরশুমে নদীর জলকে কৃষিক্ষেত

পর্যন্ত আনার জন্য বহুস্থানে নদীর বাঁধ কেটে দেওয়া হত। এই কারণে জলপ্লাবনের সম্ভাবনা যেমন বৃদ্ধি পেত, তেমনি নদীর তীর ভাঙার সম্ভাবনাও। এভাবেই নদীর বাঁধ নির্মাণ ও তার ভাঙার কাজ বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে জেমস রেনেশ ১৭৮১-তে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত An Account of the Ganges and Burrampooter Rivers গ্রন্থে গঙ্গা বা অন্য নদীতীরস্থ ভূমির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করে সেগুলিকে স্বাভাবিক নদীবাঁধ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। সরকারি প্রতিবেদকরা আবার এমন মন্তব্য করেন যে নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিল ইত্যাদির মতো বৃহৎ জলক্ষেত্র না থাকায় বন্যার সময়ে অতিরিক্ত জল নদীর দুই তীর প্লাবিত করে পুনরায় নদীতেই ফিরে আসে। সেই সঙ্গে ফিরে আসে পলি, বালিকণা ইত্যাদি। এরাই মিলিতভাবে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয় এবং সে কারণেও নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়। পুনরায় সৃষ্টি হয় বন্যার সম্ভাবনা। তবে হুগলী অঞ্চলে জমিদাররা নদী রক্ষায় সচেতন অধিক থাকায় সেখানে নদীর ভাঙনের প্রবণতা ছিল অনেক কম। তবে জমিদারি বাঁধগুলি বন্যা প্রতিরোধ ব্যতীত কিছুই করতে পারত না।

সপ্তদশ শতকের কোনো এক সময়ে দামোদর অকস্মাৎ তার গতি পরিবর্তন করে। পূর্বে সে কালনার কাছে হুগলী নদীতে এসে মিশেছিল। এবার সে আরও নীচের দিকে নয়া সড়াইতে এসে হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত হল। পুনরায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দামোদর সোজাসুজি দক্ষিণমুখী হয়ে হাওড়ার রূপনারায়ণের কাছে হুগলী নদীতে মিলিত হয়। ফলে হুগলী নদীর জলপ্রবাহ তখন থেকে জলঙ্গী, ইছামতী, মাথাভাঙা ও চূর্ণী—যাদের মিলিতভাবে নদীয়া নদী বলা হত, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। চূর্ণীকে নতুন নদী হিসাবে গণ্য করা হয় কারণ রেনেশ যখন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভাগীরথী-হুগলীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন চূর্ণীর উল্লেখ সেভাবে ছিল না। নদীয়ার নদীগুলিতে প্রতিবছরই একাধিকবার জলস্ফীতি ঘটত। কিন্তু ভাগীরথীর বাম তীর ছিল বরাবরই বাঁধের মাধ্যমে সুরক্ষিত, যার এক বড় অংশ লালতাকুড়ি বাঁধ নামে সরকারি দলিলে উল্লিখিত। এই বাঁধ মুর্শিদাবাদের আখেরিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতে প্রমাণ হয়, ভাগীরথী বর্তমান কালের মতোই সে সময়ে কতখানি বিপজ্জনক ছিল।

নদীবাঁধ যে শুধুমাত্র নদীর তীরকেই রক্ষা করত তা নয়। তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি ছিল যথেষ্ট উর্বরা। হ্যামিল্ট ন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথী-হুগলীর তীরবর্তী এলাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে হাওড়া থেকে শুরু করে বর্ধমান পর্যন্ত, প্রতিটি জেলাতেই ঐ অঞ্চলের উৎপাদিত ধানের গুণগত মান ও পরিমাণ অনেক ভাল। যদিও অষ্টাদশ শতকের চল্লিশের দশকে ঘটে যাওয়া মারাঠা বর্গির হাঙ্গামা পশ্চি ম ও মধ্য বঙ্গের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। তথাপি জমিদাররা নিজ নিজ স্বার্থে নদীবাঁধগুলির সংরক্ষণে বেশি করেছে। হ্যামিল্টন নদীবাঁধগুলিকে সেচের জল ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হত বলে দাবি করলেও স্যার উইলিয়াম উইলকক্স সেগুলিকে একমাত্র বন্যারোধেই ব্যবহার করা হত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা বহুলাংশে প্রমাণিত হয় মেজর হার্স্ট-এর প্রতিবেদন থেকে। ১৯১৫-তে তিনি নদীয়ার নদীগুলি পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভাগীরথীর বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তার তীর বাঁধানোর কাজ শুরু হয়েছিল।

সমগ্র মুঘল রাজত্বে নদীর গুরুত্ব নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। সরকারি স্তরে এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগই গৃহীত হয় নি। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সুবা দেওয়ানি লাভ করার পর নদীকে জলপথ হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে নানা উদ্যোগ নিতে থাকে। এ জন্যই ১৭৭১-এ মেজর জেমস রেনেশকে নিযুক্ত করা হয়। রেনেশের মূল কাজই ছিল প্রধানত ভাগীরথী-হুগলীর নাব্যতা পরিমাপ করা এবং বড় জলযানের সহজ যাতায়াতের পথের সন্ধান দেওয়া। অর্থাৎ ১৭৬৫-র পূর্বে নদীর জল ব্যবহার সম্পর্কে যে দেশীয় ধারণা ছিল এবার তার আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। কোম্পানি নদীয়া জেলার নদীগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করে। এই সময়েই প্রথম জানা গেল, ভাগীরথী-হুগলীর নাব্যতা হ্রাসের প্রধান কারণই হচ্ছে নদীয়ার প্রধান তিনটি নদীর জল বহনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ ভাগীরথী-হুগলীকে সচল রাখতে গেলে নদীয়ার নদীগুলিতে নাব্যতা বৃদ্ধি করা চাই।

কিন্তু নদীর গতিপথের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের কাশেমবাজারে যাবতীয় নদীবাঁধকে ভেঙে ভাগীরথী হঠাৎ তার গতি পরিবর্তন করে। ফলে ভাগীরথীর জলবহনের পূর্বের ক্ষমতা আর বজায় থাকে না। তাই ১৮১৫-তে কোম্পানি ভাগীরথীতে জলপ্রবাহ বজায় রাখতে পদ্মার সঙ্গে এক খালের দ্বারা তাকে যুক্ত করে। বলাই বাহুল্য সেই সময় থেকেই পদ্মার জলস্রোত ভাগীরথী অপেক্ষা অধিকতর হতে থাকে। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর তীর ভাঙার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আগেই বলা হয়েছে, মুঘল শাসকরা নদীর গতিপথ তথা তার নাব্যতার বিষয়ে মোটেই উৎসাহী ছিল না। কিন্তু কোম্পানি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে মুর্শিদাবাদে নদীর ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নিতে নিযুক্ত করল। লালবাগের কাছে নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৭৪৩ গজ তীর বাঁধানো হয়। কিন্তু

১৭৯৮-৯৯-এর ভয়ঙ্কর বন্যায় যাবতীয় পূর্তকাজ ধূলিসাৎ হয়। অবশ্য তারপরই মুর্শিদাবাদ শহরের রক্ষার্থে এক পাকা বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। বহরমপুরে কোম্পানির সেনানিবাস থাকায় ১৮১৮-তে বহরমপুরের কাছে নদীর তীর উঁচু করে বাঁধানোর কাজ হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও নদীর রোষ থেকে কতটা রক্ষা পাওয়া গেল — সে বিষয়ে সন্দেহ আছেই।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে ভাগীরথী-হুগলীর তীর রক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা অন্যত্র সেভাবে নেওয়া যায় নি। এ প্রসঙ্গে আমরা ২৪ পরগনার উল্লেখ করতে পারি। কোম্পানির বোর্ড অভ রেভিনিউ তার ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫ তারিখের কার্য বিবরণীতে ২৪ পরগনার নদীগুলিকে নিকাশি নালা হিসাবে উল্লেখ করেছিল। এ ক্ষেত্রে জোয়ারের জল থেকে নীচু এলাকাগুলিকে রক্ষার জন্য নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের অগণিত ছোট-বড় নদী ও খাল অদ্ভুতভাবে এক প্রাকৃতিক ভারসাম্য দীর্ঘকাল বজায় রাখছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে জঙ্গল কেটে ব্যাপক হারে কৃষিভূমির বিস্তার ঘটানোর যজ্ঞ চলতে থাকায় যাবতীয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। মুঘলদের দৃষ্টিতে নদীয়া থেকে দক্ষিণের যাবতীয় এলাকা ছিল 'ভাটি' অর্থাৎ নীচু। তারা ঐ অঞ্চলে কোনো সময়ে কৃষির বিস্তারে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক। সুন্দরবনের গুরুত্ব তারা অনুভব করল মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। প্রথমত সাগর ও কলকাতা বন্দরের মধ্যবর্তী সুন্দরবনের যোগাযোগ ও সামরিক গুরুত্ব। দ্বিতীয়ত অরণ্য ধ্বংস করে কৃষিভূমির বিস্তার ও তার মাধ্যমে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু প্রতিদিনের জোয়ার-ভাঁটায় সুন্দরবনের নদীনালা সহ নীচু এলাকাগুলি দুর্গম হয়ে উঠত। কোনো কোনো সময়ে জোয়ারের জল ২০ ফুট পর্যন্ত উঠত। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব বোর্ডের কার্যবিবরণীতেই আছে, জোয়ারের কারণে দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু করে কলকাতার পাশ্ববর্তী বহু এলাকায় নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটছে।

সুতরাং জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে তথা কৃষিজমিকে অটুট রাখতে কোম্পানির সরকার নদীবাঁধ নিকাশি ও রক্ষার নজর দিল। স্থির হল নিয়মিত নদীতীরস্থ বাঁধগুলিকে পরীক্ষা করা হবে ও তাদের ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

ভাগীরথী-হুগলীর জলপ্রবাহ বজায় রাখতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় যে জল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সেরূপ করলেই চলত না। এই অঞ্চলে জোয়ার-ভাঁটার সমস্যার কথা আমরা বলেছি। প্রতিদিন দু'বার জোয়ার আসত এবং সে কারণে নদীবাঁধকে মজবুত করা খুবই জরুরি ছিল। এ ছাড়াও এ অঞ্চলের আরও একটি বিশেষত্ব ছিল খুলনা থেকে শুরু করে মেদিনীপুর পর্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অগণিত লবণ তৈরির কারখানা ছিল। এদের বলা হত লবণ 'খেলারি'। অতএব এইসব 'খেলারি' রক্ষার কাজও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এইসব নানাবিধ কারণে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীবাঁধগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এক সময়ে মাতলা নদীর তীরে কোম্পানি ক্যানিংয়ে একটি বন্দর তৈরিতে অগ্রসর হয়। ফলে ঊনবিংশ শতক জুড়ে সুন্দরবনের নদীনালাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ চলতেই থাকে। নদীবাঁধের সুরক্ষার কারণে কৃষিকাজের বৃদ্ধি ঘটে উল্লেখযোগ্য গতিতে। নদীবাঁধগুলিকে বলা হত 'শোলবন্দী' এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় জমিদারদের। বলাই বাহুল্য, এভাবে পূর্ত ও সেচ বিভাগের আর্থিক দায় কোম্পানি সাধারণ প্রজার মাথায় চাপিয়ে দেয়। এমনইভাবে ১৮২৪-এ বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বর্ধমান ও হুগলীতে যাবতীয় জলপথগুলি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত এক চুক্তি হয়। ঐ দুই জেলায় বর্ধমান রাজের বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল। ফলে মহারাজাকেই নদীপথগুলি রক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

নদীবাঁধগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোম্পানির সরকার এক পৃথক বিভাগ পর্যন্ত স্থাপন করেছিল। ১৮৩৮-এ হুগলী জেলাতে ঐ বিভাগ তার প্রাথমিক কাজ শুরু করে। কিন্তু হুগলী নদীতে জলপ্রবাহ বজায় রাখার সমস্যা ছিল অপ্রতিরোধ্য। তার পাকাপাকি সমাধানের জন্য ১৮৪১-এ রাজমহল থেকে হুগলীর মির্জাপুর পর্যন্ত এলাকার এক খাল খননেরও প্রস্তাব হয়। তার পূর্ণাঙ্গ মাপ ছিল ১২৯ মাইল। কিন্তু সেই খনন কাজ শুরু হয় নি। ফলে ভাগীরথী-হুগলীর জলপ্রবাহের সমস্যা থেকেই গেল।

নদীর জলকে সেচের কাজেও ব্যবহার করা হত। ফলে বাঁধ কেটে জল সংগ্রহের প্রবণতা থাকায় সমস্যার নতুন আকার দেখা গেল। সরকারিভাবে সেচের কাজে নদীবাঁধকে ব্যবহার করা ও জলব্যবহারকারীদের ওপর রাজস্বের বোঝা চাপানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার 'এমব্যাকমেন্ট অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে। একই সময়ে রেল যোগাযোগ বিস্তৃত হতে থাকায় নদীবাঁধের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কলকাতা থেকে বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর পর্যন্ত প্রথম রেলপথ নির্মাণের যে পরিকল্পনা হল তা ছিল গঙ্গানদীর গতিপথ বরাবর। অনেক বিশেষজ্ঞ সেই সময়ে ঐ পথে রেললাইন না বসানোর অনুরোধ করলেও তা রক্ষিত হয় নি। কারণ, ঐ অঞ্চলগুলি ছিল ভীষণভাবে জনবহুল ও রেল পরিবহন হবে লাভদায়ক।

গঙ্গানদীর গতিপথের সমান্তরালে রেলপথ নির্মাণের ফলশ্রুতিতে যে নদীর ভাঙন বৃদ্ধি পেতে পারে — এ বিষয়ে অনেকেই সতর্ক করেছিলেন। তখন বিখ্যাত সেচ বিশেষজ্ঞ কর্নেল আর্থার কটন জনবহুল বসতিগুলির পাশে বহমান গঙ্গার তীর বাঁশের খুঁটি দিয়ে সংরক্ষিত করার প্রস্তাব দেন। তিনি অবশ্য ঐ ব্যবস্থার সাফল্য নিয়ে নিজেই সন্দিহান ছিলেন। যেহেতু ঐ

কাজ করতে সরকারের বছরে তিন লক্ষ টাকার মত ব্যয় ধরা হয়েছিল সেই হেতু সরকার আদৌ এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিল না। রেলপথ কিছু ক্ষেত্রে নদীর তীর বাঁধানোর কাজ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা যে নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয় এটাও ঘটনা। এর ফলে ১৮৬০-এর দশকে নদীয়ার নদীগুলির অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে।

কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতাকে তথা কলকাতা বন্দরকে বিশাল ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে রেল মাধ্যমে যুক্ত করতে সরকার বিশেষভাবে আগ্রহী। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ও তার জলধারণের ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্তাদের যে মানসিকতা ছিল ঊনবিংশ শতকে তার পরিবর্তন ঘটল। ঊনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যের অর্থব্যবস্থাই ছিল প্রধান বিবেচ্য — স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্যা নয়। ভাগীরথী-হুগলী সহ অন্য নদীগুলির সমস্যা তো নয়ই।

উ মা

পরিবেশবন্ধু চির দত্ত প্রয়াত

মোহিত রায়

১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ প্রয়াত হলেন চির দত্ত। কলকাতার পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা চিররঞ্জন দত্ত 'চির দত্ত' বলেই পরিচিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক চিরদা রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগেই মূলত কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। সরকারি দপ্তরে সারাজীবন চাকরি করেও তিনি আপসহীন সংগ্রামী প্রযুক্তিবিদ হিসেবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের বহু প্রকল্পের দুর্বলতা সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রযুক্তিবিদদের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মবিরতি আন্দোলন এবং ১৯৮৬ সালে ইঞ্জিনিয়াদের ঐতিহাসিক ১১২ দিনের ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দেন। গত তিন দশক ধরে সমস্ত ভারতে ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার প্রয়াসে তিনি মুখ্য ভূমিকা নেন। ইঞ্জিনিয়ারদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে সে কথা প্রচার করতে গিয়ে ধীরে ধীরে চির দত্ত পরিবেশ আন্দোলনেও মুখ্য ভূমিকা নিতে থাকেন। ১৯৯২ সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে একটি বড় নির্মাণ প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়। তখনও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি পরিবেশচর্চায় গুরুত্ব পায় নি। এই আন্দোলনে চির দত্ত উদ্যোগী হলেন ও ক্রমশ পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় এই জলাভূমি বাঁচানোর জন্য কলকাতার পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জড়িত ৩৬ সংস্থার কেন্দ্রীয় সংগঠন 'কলকাতা ৩৬' গঠিত

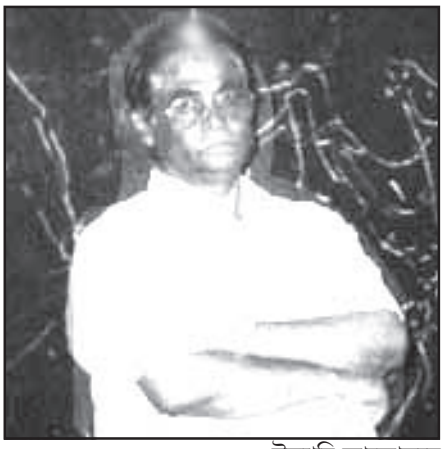

হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চির দত্ত এর প্রধান ছিলেন ও কলকাতা ৩৬কে পরিবেশ উন্নয়নের কাজে চালিত করেছেন। পাশাপাশি তিনি ইনস্টিউট অভ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ার কারণে সেই সংস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। কলকাতার প্রায় সব পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে চিরদার উপস্থিতি ছিল নিশ্চিত। গত কয়েক বছর তিনি বিক্রমগড় ঝিল রক্ষার জন্য আন্দোলন, বেকার বাজার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। সুবক্তা চির দত্ত ছিলেন জনসভার অন্যতম আকর্ষণ। তিনি আমেরিকান সোসাইটি অভ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ভারতীয় শাখার সভাপতি, ইনস্টিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর কাউন্সিল সভ্য, সায়েন্স ফর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, নিউইয়র্কের ওয়ার্লড ফেডারেলিস্ট গ্রুপের কাউন্সিলার, ফোরাম ফর ক্যালকাটার সহ সভাপতি এবং ইনডেফের মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত নিবন্ধ দেশ, আনন্দবাজার, বর্তমান, যুগান্তর, আজকাল, প্রতিদিন, আনন্দমেলা, প্রতিক্ষণ, পরিবর্তন, কালান্তর, বঙ্গলোক, মেইন স্ট্রিম প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় গত তিন দশক ধরে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ চির দত্ত ছিলেন একজন গঠনমূলক সমালোচক। তিনি কেবল নেতিবাচক বিরোধী আন্দোলন করতেন না, একজন প্রযুক্তিবিদের নির্মাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কাজের বিশেষত্ব ছিল। চির দত্তের প্রয়াণে পরিবেশ আন্দোলন একজন প্রযুক্তিবিদ সংগঠক হারালো।

উ মা

গর্ভনাশী জাদুবটিকা এবং কিছু প্রশ্ন

শ্যামল চক্রবর্তী

বিধান সরণি ধরে এগিয়ে চলেছে ট্রাম। বিলম্বিত লয়ে। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ বিপণি। ক্রেতার ভিড়। ভিড় ফুটপাথে। কিছু নারীপুরুষ সটান রাস্তায়। চলন্ত ট্রামে মনকাড়া বিজ্ঞাপন। ভুল হয়ে গেলে সেই ভুল শুধরে নেবার আহ্বান। অসতর্ক মুহূর্তে সেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়ে থাকলে দুশ্চিন্তা তো হবেই! কি জানি বাবা, কী হয়ে যায়! চলমান ট্রামে উদার আশ্বাস! নাই, নাই ভয়! মাত্র দুটো 'আই পিল!' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যস! নো টেনশন, নো ভয়!

এফ এম চলছে ভোরবেলায়, বেডরুমে। কথায় কথায়। গানে গানে। হঠাৎ ছোট্ট বিরতি। কাল রাতে 'ও' ওটা ব্যবহার করতে ভুলে গেছে? ভয় করছে আপনার? চিন্তা করবেন না। দুটো 'আই পিল' কিনে আনুন ওষুধের দোকান থেকে। খেয়ে নিন। এবার নির্ভয়ে এগিয়ে চলুন জীবনের পথে। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এখন খুব সহজ। 'ওটা' ঘটে যাবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বড়ি। বারো ঘণ্টা বাদে আর একটা। ব্যস, আপনার দায় শেষ! চিন্তাও!

বিশ্বায়িত ভারতে এখন বাসে ট্রামে, পত্রপত্রিকায়, বেতারে-দূরদর্শনে এরকম চিত্তাহরক বটিকার অকাতর আহ্বান। পাশে থাকার

ছবি: দেবাশিস রায়

প্রতিশ্রুতি। কোনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অভ্যস্ত নন আপনি? পদ্ধতি ব্যবহার করলেও কোনও কারণে সেটি ব্যর্থ হতে পারে? মুহূর্তের উত্তেজনার বশে মনে ছিল না কোনও পদ্ধতির সাহায্য নিতে? ভাবনা কীসের! এসে গেছে মুশকিল আসান ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। করাতে হবে না কোনও পরীক্ষা। ওষুধের দোকান থেকে শুধু কিনে নিতে দুটো ম্যাজিক-বড়ি। খেয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। তাতেই মুক্তি পাওয়া যাবে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে।

কোন দেশে? মহান ভারতে। যে দেশে যত গর্ভসঞ্চার ঘটে বছরভর তার ৭৮ শতাংশই অপরিকল্পিত। চাওয়া হয় নি, তবু ঘটে গেছে। এর মধ্যে পঁচিশ শতাংশ গর্ভ পুরোপুরি অনাকাঙ্ক্ষিত। আনওয়ান্টেড। চাওয়ার প্রশ্নই ছিল না, তবু ঘটে গেছে। যে দেশে অবাঞ্ছিত, অযাচিত গর্ভের হাত থেকে রেহাই পেতে বছরে গর্ভপাত করানো হয় কম করে ১৫৫ লক্ষ। আর এরকম গর্ভপাত করাতে গিয়ে বছরভর মারা যায় কমপক্ষে ২০ হাজার নারী। যে দেশে গর্ভবতী মহিলাদের অন্তত ৭০ শতাংশ অপুষ্টির শিকার, শিকার রক্তাল্পতার। যে দেশে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিতে বছরভর কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও, এখনও পর্যন্ত প্রজননশীল দম্পতিদের অর্ধেক বা তারও বেশি এই ঢাকঢোল পেটানো কর্মকাণ্ডের বাইরে। যেখানে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম দম্পতিদের মাত্র ৪৮ শতাংশ কোনও জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করেন, বাকি ৫২ শতাংশ করেন না বা করতে রাজি হন না।

এমন এক মহান দেশে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাবার এরকম এক সহজ পদ্ধতির আন্তরিক আহ্বানে যে লক্ষ লক্ষ নারী সাড়া দেবেন, এ তো স্বাভাবিক। এরকম পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরী (৭০%-৯৫%) হওয়ায় এতে এড়ানো যাবে অসংখ্য অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার। গল্পটা এই পর্যন্ত বেশ সরল। এরপর থেকে শুরু জটিলতার। যখন জানা যায়, প্রাক্‌বৈবাহিক যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ এখন এ দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এমনিতেই এ দেশে কনডোমের ৮৭ শতাংশ ব্যবহার হয় বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আর কনডোম পুরোপুরি না হলেও অনেকটা নিরাপত্তা দেয় এইচ আই ভি সহ নানা ধরনের যৌনরোগের সংক্রমণ আটকাতে। সমীক্ষায় প্রকাশ, ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ (ই সি) বড়ির জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম সম্পর্কে কনডোমের ব্যবহার কমছে।

এ গল্প তাই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর। কেন না বহু মহিলা অন্যান্য জন্মরোধ ব্যবস্থার বিকল্প বানিয়ে ফেলছেন ই সি পিলকে। এভাবে চলতে থাকলে জন্মনিয়ন্ত্রণের চালু ব্যবস্থাগুলোর ব্যবহার কমবে। কমবে কনডোমের ব্যবহার। বাড়বে এখনই 'মহান ভারত'-এর ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এইডসের আগ্রাসন। দিনদিন আরও বেশিমাত্রায় চাপ বাড়বে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা

মহিলাদের ওপর। পুরুষসঙ্গীর সব দায় নারীর সঙ্গে জুড়ে দেবার চাপ। জন্মরোধের দায় একা একা বয়ে চলার চাপ। কনডোমহীন মিলনে যৌনরোগের ঝুঁকির চাপ।

জরুরি গর্ভনিরোধক এ দেশে এসেছে মোটামুটিভাবে বছর দশ আগে। এরকম ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলেছে বেশ কিছুকাল ধরে। তারও অনেক আগে থাকতে চালু ছিল সহবাস-পরবর্তী গর্ভসঞ্চার আটকানোর কিছু ওষুধ। পোস্টকয়টাল পিল, মর্নিং আফটার পিল। সাধারণ গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা নেন নি, এমন মহিলারা সহবাসের পর নির্দিষ্ট মাত্রায় সাধারণ জন্মরোধের বড়ি বা ওরাল কনট্রাসেপটিভ খেয়ে আটকাতে পারতেন গর্ভসঞ্চার। কিন্তু তেমন জনপ্রিয় ছিল না এই পদ্ধতি। কারণ অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব। পাশাপাশি তেমন প্রচারও ছিল না এরকম ব্যবস্থার।

জন্মরোধের বেশিরভাগ বড়িতে থাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি স্ত্রী-যৌন হরমোন এস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন। নির্দিষ্ট মাত্রায় এই দুই হরমোন মেশানো পিল ঋতুচক্রে নির্দিষ্ট সময় ধরে একটানা খেয়ে গেলে আটকানো যায় গর্ভসঞ্চার। সহবাসের পর এরকম বড়ি খেতে হয় স্বাভাবিকের চাইতে বেশিমাত্রায়। এই ওষুধের ব্যবহারে দেখা দিতে পারে নানা ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া। এটাও সেভাবে চালু না হওয়ার আর একটা কারণ।

পশ্চিমের দেশগুলোতে প্রাক্‌বৈবাহিক যৌন-সংসর্গের ব্যাপকতা আজকের নয়, বহুদিনের। অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে গর্ভসঞ্চারের ঘটনা ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের মত দেশে মারাত্মক এক সমস্যা। কেন না কম বয়সে, অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়ায় অসংখ্য মেয়েকে ওসব দেশে গর্ভপাত করাতে হয়। জীবনের স্বাভাবিক বৃত্ত থেকে ছিটকে যায় এদের অনেকে। অকালে মৃত্যু তো আছেই, আছে মানসিক সমস্যা। এরকম অনেক কিশোরী শিক্ষার বা কাজকর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। হারিয়ে যায় জীবনের আনন্দ। আর এই ব্যাপক প্রাক্‌বৈবাহিক মাতৃত্ব আর গর্ভনাশের চাপ গিয়ে পড়ে দেশের সরকারের ওপর। ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ এরকম গর্ভসঞ্চার আর তার জটিলতাগুলোকে অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে। এই প্রয়োজনের হাত ধরে এরকম ওষুধ নিয়ে গবেষণা, গবেষণার হাত ধরে ই সি-র জন্ম।

এ দেশে ই সি আসে ২০০০ সালের পর। ২০০১ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ভারতে এক জাতীয় সম্মেলন হয় এই ওষুধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তখন থেকেই চালু হয়ে যায় নতুন এই ওষুধ। ২০০৩ সাল থেকে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক 'ই-পিল' বিনা পয়সায় বিতরণ শুরু করে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল থেকে। পাশাপাশি বহুজাতিক ওষুধ সংস্থার তৈরি এরকম ওষুধও এ দেশের সর্বত্র চলে আসে। প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে কেনার ব্যবস্থা থাকলেও বিনা ব্যবস্থাপত্রে পাওয়া যেত প্রথম থেকেই, আজও পাওয়া যায়।

ম্যাজিক ওষুধ ই সি

আই পিল বা ই পিল-এ থাকে খুব উঁচুমাত্রায় এক ধরনের কৃত্রিম প্রোজেস্টেরন। ৭৫০ মাইক্রোগ্রাম লিভোনরগেস্ট্রেল হরমোনযুক্ত এই বড়ি। জন্মরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি এমন যৌন সংসর্গের পর মোটামুটি ১২ থেকে ১২০ ঘণ্টার মধ্যে খেতে হয় একটা, বারো ঘণ্টা বাদে আর একটা। শতকরা পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে এই বড়ি আটকে দিতে পারে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা। মিলনের পর যত তাড়াতাড়ি প্রথম বড়িটি খাওয়া হবে, এর কার্যকারিতা তত বাড়বে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এরকম ওষুধ ছাড়াও নানা ধরনের জরুরি জন্মরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সহবাস পরবর্তী জন্মরোধের চালু বড়ি (ও সি পি) বেশিমাত্রায় ব্যবহারের কথা আগে বলা হল। এ ছাড়াও রয়েছে 'মিফেপ্রিসটোন'। এটি সাধারণত মিলনের পাঁচদিনের মধ্যে পঞ্চাশ মিলিগ্রামের একটি বড়ি হিসেবে খেতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ওষুধ মাত্র দশ মিলিগ্রাম মাত্রায় খেলেও এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার আটকে দেয়। এই ওষুধগুলো বাদে রয়েছে নানা ধরনের জরায়ুর মধ্যে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা (ইনট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস)। যেমন লুপ, কপার টি। মিলনের ১২০ ঘণ্টার মধ্যে জরায়ুর মধ্যে এরকম ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঢুকিয়ে দিলেও তা গর্ভসঞ্চার আটকায়।

তবে এরকম নানা পদ্ধতির মধ্যে এখন সবচাইতে জনপ্রিয় উঁচুমাত্রায় প্রোজেস্টেরন হরমোনযুক্ত দুটি বড়ির ই সি। সরকারি ই পিল বাদে অন্তত পাঁচটা নামে কিনতে পাওয়া যায়।

ই সি খাবেন কারা

মোটামুটিভাবে দু শ্রেণীর মহিলার জন্য এরকম ওষুধ ব্যবহারের কথা —

(১) প্রথম শ্রেণীর মহিলা যিনি যৌন সংসর্গের সময় কোনও ব্যবস্থাই নেন নি বা নিতে পারেন নি। এঁদের আবার ভাগ করা যায় চারভাগে :

*আকস্মিক যৌনসংসর্গ — যেখানে ব্যবস্থা নেবার কোনও উপায় ছিল না।

*ধর্ষণ — যেখানে ব্যবস্থা নেবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

*সিদ্ধান্তের ভুল — জন্মরোধের ব্যবস্থা ছাড়া মিলিত হবার সিদ্ধান্ত বাস্তবে মেনে চলা সম্ভব হয় নি।

*একতরফা সিদ্ধান্ত — যেখানে ব্যবস্থা ছাড়া মহিলা মিলনে অসম্মত হলেও তাঁর সম্মতি ছাড়াই পুরুষসঙ্গী মিলিত

হয়েছেন। এ দেশে অসংখ্য বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা বা তাঁর পুরুষসঙ্গী যিনি মিলনের সময় জন্মরোধের ব্যবস্থা নিলেও কোনও কারণে তা কার্যকর হয় নি। ব্যবস্থার এরকম ব্যর্থতা মহিলা বা তাঁর সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন। যেমন:

(ক) কনডোম বা ক্যাপ শ্লিপ করা বা সরে যাওয়া, ফেটে যাওয়া বা লিক করা

(খ) জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খেলেও কোনও কারণে তা—

* দু'দিন বা তার বেশি বাদ পড়ে গেছে।

* সঠিক সময়ে শুরু করা যায় নি।

* বড়ি খেলেও বমির সঙ্গে তা বেরিয়ে যাচ্ছে।

* বেড়াতে গিয়ে সঙ্গে না আনায় খাওয়া হয় নি।

(গ) লুপ বা কপার টি পরা থাকলেও মহিলা মিলনের পর বুঝতে পেরেছেন ব্যবস্থাটি ঠিক জায়গায় নেই, হয়তো ওটি শরীরের বাইরে বেরিয়ে গেছে।

(ঘ) পুরুষসঙ্গী প্রত্যাহার পদ্ধতি (উইথড্রয়্যাল মেথড) ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও কখনও তা ব্যর্থ হয়েছে।

(ঙ) স্ত্রীর জরায়ুর মুখে ডায়াফ্রাম বা সারভাইকাল ক্যাপ পরা থাকলেও মিলনের সময় তা সরে গেছে।

(চ) অনিরাপদ সময় (আনসেফ পিরিয়ড)-এ মিলিত না হবার সিদ্ধান্ত থাকলেও আকস্মিকভাবে তা ঘটে গেছে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে মিলন বা ধর্ষণ আর কোনও জন্মরোধ ব্যবস্থার ত্রুটি বাদে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ বড়ি ব্যবহার করা যায় আকস্মিক মিলিত হবার পর। বেশিরভাগ সময় এরকম ওষুধ ব্যবহার হয় এমন যৌন সংসর্গের পর। ই সি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে এখান থেকেই। আকস্মিক যৌন সংসর্গ যেমন বিবাহিত দম্পতিদের বেলায় ঘটে, ঘটে বিবাহবহির্ভূত বা কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও। শুধু পশ্চিমের দেশে নয়, এ দেশেও।

সেক্স ইজ আ ফান

'যৌনতার মজা' উপভোগ করার ক্ষেত্রে এ দেশের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমের দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের চাইতে এই মুহূর্তে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। বিশ্বায়িত ভারতে ঘরে ঘরে কমপিউটার, একান্তে নীলছবির নিভৃত প্রদর্শন। রগরগে যৌনতার তীব্র হাতছানি। যৌনশিক্ষার তীব্র অভাব। অভাব সুস্থ বিনোদনের। যুবক যুবতীদের সামনে আদর্শগত কোনও স্বপ্ন নেই, নেই লক্ষ্য। এই অভাবের ফাঁকটুকু ভরাতে দ্রুতলয়ে ঢুকে পড়ছে 'সেক্স্ ইজ আ ফান'-এর মদির আহ্বান।

কম বয়সে প্রাক্‌বৈবাহিক যৌনমিলনের ঘটনা দিনদিন বাড়ছে, বাড়ছে বিয়ের আগে মেয়েদের গর্ভসঞ্চারের ঘটনা। ১৯৯৬ সালে দেশের নানা শহরে প্রাক্‌বৈবাহিক যৌনতা নিয়ে চালানো নানা অনুসন্ধানের ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছিল। দেখা যায় শহরাঞ্চলের ১৬ ও ১৮ বছর বয়স এমন ছেলে আর মেয়েদের প্রতি দশজনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ'জনের অভিজ্ঞতা রয়েছে যৌনমিলনের। এ ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চাইতে এগিয়ে। শহরাঞ্চল এগিয়ে গ্রামাঞ্চলের চাইতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যান্ডের মতো ভয়ঙ্কর অবস্থা এখনও এ দেশে তৈরি হয় নি। তবে সেই অবস্থা তৈরি হতে আর খুব বেশি দেরিও নেই। প্রাক্‌বৈবাহিক যৌনসংসর্গ বাড়ছে, বাড়ছে অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে গর্ভসঞ্চারের হার। স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে গর্ভমোচনের ঘটনা, গর্ভপাতের জটিলতা। গোপনে, অযোগ্য লোককে দিয়ে গর্ভপাত করাতে গিয়ে প্রত্যেক বছর নানা ধরনের সমস্যার শিকার হচ্ছে অসংখ্য মেয়ে, অকালে মরতে হচ্ছে কয়েক হাজার মেয়েকে।

এরকম এক জটিল সামাজিক অবস্থা তৈরি হতে সাহায্য করেছে যে সামাজিক শর্তগুলো যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী তার মধ্যে সবচাইতে জরুরি। মানসিক নৈকট্যের দরকার নেই, দরকার নেই মনের বোঝাপড়ার, যৌনতার সাময়িক আনন্দটুকু পেলেই হল। সুস্থ যৌনতা যে দায়িত্ববোধ দাবি করে তার ছিটেফোঁটাও নেই আজকের তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগের মধ্যে। নেই অনেক অনেক বড় হয়ে যাওয়া নারীপুরুষের মধ্যেও। ভোগবাদী জীবনের রঙিন বুদ্বুদে মশগুল হওয়া সহজ, সহজ ভোগবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। লাগাও ফুর্তি!

যৌনতাকে ফুর্তি বানিয়ে ফেলার এই যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এর দায় অনেক কিছুর। পরিবারের পরিবেশ, সুস্থ শিক্ষার অভাব, সুস্থ সাংস্কৃতিক বিনোদনের অভাব, জীবনের যান্ত্রিকতা, আত্মসর্বস্ব জীবনবোধ, সুস্থ যৌনচেতনা গড়ে না ওঠা, সাহিত্যরহিত জীবন, সমাজ সচেতনতা তৈরি না হওয়া, যৌনশিক্ষার একান্ত অভাব— মূল দায় এসব বাস্তবতার। দায় সামাজিক অবক্ষয়ের, আদর্শহীনতার, ধান্দাসর্বস্ব রাজনীতির।

এরকম একটা জটিল সমস্যার মোকাবিলার দায় এড়াতে পারে না সরকার। যুবসমাজকে শিক্ষায়, চেতনায় উন্নত করার জন্য দরকার শিক্ষার আমূল সংস্কার। দরকার দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি। এত ঝামেলায় যেতে রাজি নয় ভারত সরকার। প্রাক্‌বৈবাহিক যৌন সংসর্গে ঝুঁকি এড়াতে আগে কনডোম ছিল ভরসা। এখন এসে গেছে ই সি। যৌনতায় লিপ্ত হচ্ছ হও। শুধু পিলটা খেতে ভুলো না। কাজ হবে তাতেই। অন্তত এড়ানো যাবে অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার।

একই বার্তা বড় হয়ে যাওয়া অবৈধ, অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত নারী-পুরুষের কাছে। করছ করো, শুধু তাড়াতাড়ি পিলটা

ব্যবহার করতে ভুলো না। এরকম সম্পর্কে কনডোমের ব্যবহার কমছে, বাড়ছে যৌনরোগের ঝুঁকি, এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেভাবে শোনা যায় না একটাও কথা। জানা যায় না, ই সি-র প্রচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন ব্যভিচারের হার বাড়ছে কি না। জানা যায় না, কতটা বা কী হার কমছে কনডোমের ব্যবহার। বিবাহিত দম্পতিদের একাংশ নিয়মিত জন্মরোধের ব্যবস্থা ছেড়ে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এরকম মুশকিল আসান বড়ি। নারীস্বাস্থ্যের ওপর যার প্রভাব খারাপ হতে বাধ্য। কতটা খারাপ বলা যাবে না। কেন না এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে তেমন কোনও সমীক্ষা হয় নি। হয় নি ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ নিয়ম করে ব্যবহারের প্রভাব নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, পর্যলোচনা।

নানা ধরনের ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ

ওষুধ/পদ্ধতি	ব্যবহারের পদ্ধতি	কার্যকারিতা
ইমার্জেন্সি লিভোনরগেভেট্রল	১২০ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টার তফাতে দুটো বড়ি মুখে খাওয়া	৭০%-৯৫% [গড়ে ৮৫%]
জন্মরোধের কমমাত্রার বড়ি [মালা এন, ওভরাল এল]	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ৪টে বড়ি, ১২ ঘণ্টা বাদে আরও ৪টে	৭৫%
জন্মরোধের বেশিমাত্রার বড়ি [ওভরাল জি]	একইভাবে ২ ২, ৪টে বড়ি	মোট ৭৫%
১০ মিগ্রা মিফেপ্রিস্টোন বড়ি	১২০ ঘণ্টার মধ্যে একটা বড়ি মুখে খাওয়া	৮৫% -৯০%
কপার টি বা লুপ	সাতদিনের মধ্যে জরায়ুতে নির্দিষ্ট স্থাপন	৯৯%-১০০%

নির্বিকল্প ই সি!

স্বাভাবিক বা প্রচলিত জন্মরোধের পদ্ধতির ব্যবহারে ভুল হয়ে গেলে বা আকস্মিক মিলনে কোনও পদ্ধতি না নিতে পারলে ইমার্জেন্সি পিল হল শেষ উপায়। দ্য লাস্ট চান্স কনট্রাসেপটিভ বা ব্যাক আপ কনট্রাসেপটিভ। কোনওভাবেই এই পিল প্রচলিত জন্মরোধের বিকল্প নয়। কচিৎ কদাচিৎ এই পিল ব্যবহারের কথা, চালু জন্মরোধ পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে বারবার নয়।

বাস্তবে, অন্তত এ দেশে এরকম পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন নারীপুরুষের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত হাতে গোনা। যেসব কেন্দ্র থেকে সরকারি 'ই পিল' বিতরণ হয় বিনা পয়সায়, সেখান থেকেও এ বিষয়ে পাওয়া যায় না সঠিক তথ্য, পরামর্শ। দিনে দিনে 'ই পিল' এ দেশে প্রচলিত জন্মরোধ পদ্ধতির বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে আরও বেশি করে। কনডোমের মত করে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বড়ি। কমছে প্রচলিত পদ্ধতিতে আগ্রহ, এরকম পদ্ধতির ব্যবহার। এভাবে চলতে থাকলে দিনে দিনে আরও কমবে।

বিশ্বায়িত ভারতের নতুন প্রজন্মের জীবনবোধে দায়িত্ববোধ দিনদিন কমছে কিনা এ নিয়ে তুফান তোলা যায় চায়ের কাপে। তবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নয়, ভেবেচিন্তে আগে থাকতে প্রস্তুতি নেওয়া নয়, যে কোনও সমস্যার চটজলদি সমাধান চাইছে নতুন প্রজন্ম। খিদে পেলে রোল-পিৎজা-বার্গার, তেষ্টা পেলে নরম পানীয়, মিলনের ইচ্ছা জাগলে ই পিল বা আই পিল। আজকের নওজোয়ানদের বেশিরভাগের জীবনবোধে যৌনতা নিছক মজা ! নিরাপদে মজা করার আশ্বাস জোগায় ঐ দুটোমাত্র ম্যাজিক বড়ি। আই পিল এত বেশি চালু হবার পেছনে আজকের এই মনস্তত্ত্বের দায় বেশ খানিকটা।

এখানে একটা তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে। 'ই পিল' নয়, তথ্যটা কনডোম নিয়ে। কনডোম যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের নিয়ে একটা বড়মাপের সমীক্ষা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। দেখা গেল, যত কনডোম তৈরি হচ্ছে তার মাত্র ৪০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য-মিলনে। বাকি ৬০ শতাংশ বিবাহবহির্ভূত যৌনমিলনে। ১৯৯০ সালে বিশ্বে কনডোম তৈরি হয়েছিল ৬৫০ মিলিয়ন। দম্পতিরা ব্যবহার করেছিলেন ৩৫০০ মিলিয়ন, বাকিটা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত পুরুষেরা।

কনডোমের ব্যবহার কমে পিলের ব্যবহার বাড়লে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ই পিল নিয়ে জোরদার সওয়াল করছেন যাঁরা, এ প্রশ্ন তাঁদের মাথায় নেই?

এ দেশে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিতে তথ্যদান-শিক্ষাদান ব্যবস্থার মান আজও এতটাই করুণ যে 'ই পিল' বিতরণের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত তথ্যাদি মহিলাদের মধ্যে ছড়ায় না। তৈরি হয় না এ বিষয়ে সচেতনতা। দুধের ডিপো যেমন শুধু দুধ বিতরণ করে, এরকম পিল বিতরণ কেন্দ্রগুলোর ভূমিকাও প্রায় সেরকম। এ দেশের এক শ্রেণীর মহিলার কাছে ই পিল তো চালু জন্মরোধ পদ্ধতির বিকল্প হয়ে উঠবেই! হয়ে উঠবে মুশকিল আসান! একবার নয় বারবার।

দিনেদিনে ই পিল হোক বা বাজারি 'নরলিভো', 'ই সি টু', 'পিল সেভেনটিটু', 'প্রিভেনটল' বা 'নো প্রেগ'-এর মতো প্রোজেস্টেরনযুক্ত আপৎকালীন বড়ির ব্যবহার বাড়ছে। দুটো বড়ি মাত্র ৪০-৬০ টাকায় পাওয়া যায় প্রায় যে কোনও ওষুধের দোকানে, বিনা প্রেসক্রিপশনে। সঙ্গে বমি আটকাবার ওষুধ পর্যন্ত। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে 'মাইফিপ্রিন', 'মাইফিজেস্ট' বা 'এম টি পিল' নামের মিফেপ্রিস্টোন বড়ির এমার্জেন্সি পিল হিসেবে বিক্রি দিনদিন বাড়ছে। ডাক্তারের

পরামর্শ ছাড়া এরকম বড়ি খাবার কথা নয়, এরকম বড়ি খেয়ে জটিলতা (একটোপিক প্রেগন্যান্সি) দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জীবনহানিও অসম্ভব নয়। এরকম ওষুধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে খুচরো ওষুধের দোকানে, বিনা প্রেসক্রিপশনে। 'মেরা ভারত' এত উদার, এত মহান!

নানা ধরনের জন্মরোধের পদ্ধতি

পদ্ধতি	প্রথম বছর প্রতি ১০০ জনের ব্যর্থতা	সুবিধা/অসুবিধা
মুখে খাবার পিল (ও সি পি)	১-৮ জনের	ব্যবহার করা সহজ। সবাই ব্যবহার করতে পারবেন না। ব্যবহারের আগে ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।
কনডোম	৫-২০ জনের	সহজলভ্য, মিলনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।
ডায়াফ্রাম	৫- ২৫ জনের	সবার পক্ষে স্বস্তিকর নয়, এদেশে সহজলভ্য নয়।
ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট	১০-৩০ জনের	দাম বেশি, কিছু মহিলার পক্ষে অস্বস্তিকর।
প্রত্যাহার পদ্ধতি	৫-২৫ জনের	অস্বস্তিকর।
ছন্দ পদ্ধতি	১০-৩০ জনের	সবসময় মেনে চলা কঠিন।
কপার টি, লুপ	গড়ে ১ জনেরও কম	ব্যাপকভাবে কার্যকরী সন্তান নেই এমন মহিলারা নিতে চান না। পরে থাকার প্রভাব নিয়ে নানা গুজব, ভ্রান্ত ধারণা।
হরমোন ইমপ্ল্যান্ট	.২ জনের	দাম বেশি, চিকিৎসকের সাহায্য দরকার।
ভ্যাসেকটমি বা নির্বীজকরণ	.১৫- ১জনের	স্থায়ী ভালো পদ্ধতি। শারীরিক প্রভাব নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা, গুজব।
টিউবেকটমি বা লাইগেশন বা বন্ধ্যাকরণ	.২-১জনেব	স্থায়ী ভালো পদ্ধতি। শারীরিক প্রভাব নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা, গুজব।

ইমার্জেন্সি কনট্রাসেপটিভ

পদ্ধতি	সুবিধা/অসুবিধা
ই পিল	তাড়াতাড়ি খেলে যথেষ্ট কার্যকরী। গা গোলানো, বমি, স্তনে স্পর্শে ব্যথার মত প্রতিক্রিয়া।
কপার টি	যথেষ্ট কার্যকরী। জরায়ুর সন্নিহিত অঞ্চলে সংক্রমণের ঝুঁকি। সন্তান নেই এমন মহিলাকে না-পরানো ভালো।
মিফেপ্রিস্টোন বড়ি	কার্যকরী। পরবর্তী ঋতু শুরু হতে দেরী, ডিম্বনালীতে গর্ভসঞ্চার (একটোপিক প্রেগন্যান্সি)-এর ভয়।
জন্মরোধের বড়ি (ও সি পি)	তুলনায় কম কার্যকরী, অসফল হলে ভ্রূণের জন্মগত ত্রুটির আশঙ্কা।

এ লগন বহুজাতিকের

ছবি: দেবাশিস রায়

যেসব প্রোজেস্টেরন বা মিফেপ্রিস্টোনযুক্ত ই সি পিল এ দেশে পাওয়া যায় তার কোনওটাই দেশি প্রস্তুতকারকদের তৈরি নয়, এগুলোর নির্মাতা বহুজাতিক সংস্থা। সরকারি ব্যবস্থায় যা ই সি বড়ি বিতরণ হয় তার অন্তত একশোগুণ বিক্রি হয় বেসরকারি ই সি। আর কে না জানে ঐসব সংস্থার লাভের হার একশো থেকে দু'হাজার শতাংশ।

এম টি পিল বলুন বা ই সি টু — ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াই খুচরো বিক্রির পক্ষে কয়েক বছর আগে জোরদার সওয়াল করেছিলেন এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এঁদের ওপর ওষুধ প্রস্তুতকারকদের প্রভাব? এ গল্প আপাতত থাক। শুধু জানা থাক, দশক তিনেক আগে ই পি ফোর্ট গোছের উঁচুমাত্রার এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনযুক্ত ওষুধ বিকলাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয় জেনেও এ শহরের বেশ কয়েকজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ সওয়াল করেছিলেন বহুজাতিকের তৈরি ঐ ওষুধ চালু রাখার পক্ষে। আড়ালে ছিল সিলভার টনিকের বড়মাপের ভেলকি।

নির্দোষ নয় ই সি পিলও

উঁচুমাত্রার প্রোজেস্টেরনযুক্ত ই সি পিল খেয়ে গা গোলাতে, হতে পারে বমি। দেখা দিতে পারে স্তনে ব্যথা। পরবর্তী ঋতু বিলম্বিত হতে পারে। খেতে দেরি হলে গর্ভসঞ্চারের ভয় তো আছেই (১৫%-৩০%)। ওরাল কনট্রাসেপটিভ পিল ৪টে বা ৮টার মাত্রা খেয়ে গা-গোলানো, বমি, মাথা ঘোরা, ঋতু অনিয়মিত হবার প্রতিক্রিয়া বিরল নয়। বিরল নয় এরকম বড়ি খেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা। মিফেপ্রোস্টল বড়ি খেয়ে ঋতু অনিয়মিত হতে পারে, দেখা দিতে পারে জরায়ুর বদলে ডিম্বনালীতে

গর্ভসঞ্চারের ঘটনা। এরকন জটিলতা মারাত্মক, যে কোনও সময় ডিম্বনালীর গর্ভ ফেটে বিপন্ন হতে পারে প্রাণ। যদি না দ্রুত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা যায়।

ই পিল খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বমি হয়ে গেলে ওষুধ কাজ করে না। গর্ভরোধের পিল (ও সি পি) নিয়েও একই কথা। যে কোনও ই সি কাজ না করলে গর্ভসঞ্চার হয়ে সেই গর্ভ জরায়ুর মধ্যে বড় হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারিখ পেরোনোর সাত দিন পার করে নির্দিষ্ট পরীক্ষা করানো জরুরি। জরুরি ঐ গর্ভের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, প্রয়োজনে গর্ভপাত করিয়ে নেওয়া।

এই জরুরি তথ্যগুলো শতকরা ৯৯ জন জানা সম্ভবও নয়। অথচ এসব তথ্য না জেনে খাওয়ার কথা নয় ই সি পিল। কেন ওষুধের দোকান থেকে ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া ই সি বিক্রির এই বিপুল আয়োজন? ই সি প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থাগুলো এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়। 'তথ্যের অধিকার আইন'-এ এ প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার যে কোনও সচেতন নাগরিকের আছে। অধিকার আছে ইংল্যান্ডের সমীক্ষার ফলাফল মেনে নিয়ে এ দেশে এরকম ওষুধকে 'ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ' (ও সি ডি) করে দেবার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার।

তথ্যসূত্র

১.WHO/FRH/FPP/98,19,97,33.

২ ISNN 92-4 154475-9-NLM Classification:-WP30

৩.HAIDER, SJ et al, 1997-Study of Adoloscents Dynamics of attitude: Knowledge, Perception & Use of reproductive health Care.

৪.JeGeeboy, S. 1996.

৫.Journal of Human Reproduction; Volume 9 1994.

৬.UNFPA 1999.

৭.Population Action 1996.

৮.WOH/PHE/FPP/95/

৯.Emergency Contraceptive; Prof. S.K.Paul 2005

১০.New England Journal of Medicine: 333 (23).

১১.Show's Text Book of Gynaecology; Latest Edition.

১২.Unmet need for family Planning; WHO 1994.

ঋণস্বীকার : ডাঃ সুবীর ভট্টাচার্য।

দুঃখিত

গত সংখ্যায় ছাপার একটু ভুল হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত'রামকৃষ্ণ অন্য চোখে' বইটি নিরঞ্জন ধরের লেখা। রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়-এর নয়।

গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব

এখন থেকে ২৯ বছর আগে ১৯৮২ সনে হরিণঘাটা এলাকার নারায়ণপুর গ্রামে গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু। ক্রীড়া উৎসব ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিকড় ছড়াতে শুরু করে। মাটির মানুষের কাছ থেকে জীবনীশক্তি পেয়ে এ পর্যন্ত আরও সাতটি এলাকায় ডালপালা বিস্তার করেছে। এলাকাগুলি হল বিদ্রোহী সংঘ, উত্তর রাজাপুর;সুকান্ত পল্লী, হরিণঘাটা;ত্রিশক্তি সংঘ, লাউপালা;শিবশক্তি সংঘ, ভাতশালা;পল্লী উন্নয়ন সমিতি, সিমহাট; আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি, বড়জাগুলি এবং সঙ্ঘশ্রী, আনন্দপুর। মূলত এলাকার মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া উৎসবের মানোন্নয়নের আশায় ২০০৭ থেকে আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু হয়। গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে এরকম এলাকাই কেবল উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে এক একটি এলাকায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সংঘটিত হয়েছে।

২০০৭ প্রথম বর্ষ, উত্তর রাজাপুর। ২০০৮ ক্রীড়া উৎসব হয় নি। ২০০৯ দ্বিতীয় বর্ষ সুকান্ত পল্লী, হরিণঘাটা। ২০১০ তৃতীয় বর্ষ নারায়ণপুর।

ক্রীড়া উৎসবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল :

১. প্রকৃত জন উদ্যোগ বলতে যা বোঝায় ক্রীড়া উৎসব তাই। সুষ্ঠুভাবে ক্রীড়া পরিচালনার ক্ষেত্রে এলাকার উৎসাহী ক্রীড়াবিদ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষকগণ সাহায্য করে থাকেন।

২. অর্থসংগ্রহের জায়গা থেকে প্রতিটি এলাকাই নিজ নিজ সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। যার ফলে প্রতিটি ক্রীড়া উৎসবেই আর্থিক সীমাবদ্ধতার ছাপ স্পষ্ট। ক্রীড়া উৎসব কমিটিগুলির আবেদনে পঞ্চায়েত থেকে কোনো কোনো সময় কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। এটা অনিয়মিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আর্থিক সংকটের জন্য কোনো কোনো এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে।

৩. আমাদের গ্রামীণ জীবনে মহিলাদের জীবন তুলনামূলকভাবে কিছুটা ঘরমুখী বলে ক্রীড়া উৎসব তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রতিটি এলাকার ক্রীড়া উৎসবের সময় মহিলাদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকেই এটা স্পষ্ট।

৪. আমাদের এই বিভেদমুখিন সমাজে মানুষে মানুষে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে ক্রীড়া উৎসব মনে হয় সবার ওপরে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

প্রশ্নগুলো সহজ

৮০-র দশকে বাংলা ভাষায় একটি নতুন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে — যৌন-কর্মী। এর আগে নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলাদের বলা হত 'পতিতা', 'দেহ-ব্যবসায়ী' ইত্যাদি। এই শব্দগুলোর তুলনায় 'যৌনকর্মী' শব্দের শ্রুতিমাধুর্য অনেক বেশি। ফলে শব্দটি ইদানীং বাংলাভাষায় একটা স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে।

এখন কথা হল কারা এই যৌনকর্মী? আমার জানা বোঝার মধ্যে রয়েছে একদল অভাবী ঘরের মেয়ে-বউ। এদের বয়স অল্প, শিক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে। মনে অ-নে-ক সাধ আর চোখে রঙিন স্বপ্ন। এদের প্রায় সকলেই বিয়ে করে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু সংসারের অভাব অনটন আর শ্বশুরবাড়ির অমানুষিক অত্যাচারে তাদের স্বপ্ন যায় ভেঙে, মনের ইচ্ছা যায় তলিয়ে। তারা বাধ্য হয় ঘর ছাড়তে। একটু আশ্রয় আর দু-মুঠো খাবারের জন্য ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে, পরোপকারীর মুখোশধারী হিতৈষীদের হাত ধরে এসে ওঠে নিষিদ্ধ পল্লীতে। কোথায় এসে পড়ল এটা যখন তারা বুঝতে পারে, তখন আর বেরোবার পথ থাকে না। তখন তাদের নতুন পরিচয় হয় 'পতিতা', ইদানীং 'যৌনকর্মী'।

গত কয়েকবছর ধরে এই যৌনকর্মীদের নিয়ে নানান কাজকর্ম চলছে। অনেক সংগঠন তৈরি হয়েছে, এদের দাবি দাওয়া নিয়ে অনেক আন্দোলন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি হচ্ছে। তাদের কাজকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি নিয়েও অনেক আন্দোলন করে সম্প্রতি আইনি স্বীকৃতিও আদায় করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা থেকে গেছে এইখানেই, যে দেশে কলকারখানায় খাটা শ্রমিকরাই আজও পর্যন্ত যথার্থ শ্রমিকের মর্যাদা পায় নি, সে দেশে নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা সেই মর্যাদা পাবে কী করে? হ্যাঁ, তবে একথা সত্যি যে, নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন, মিছিল, সংগঠন ইত্যাদি হওয়ার ফলে, এই মহিলারা বাড়িওয়ালি, দালাল, পুলিস ইত্যাদিদের অত্যাচার হাত থেকে কিছু অংশে হলেও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু যা পায় নি, তা হল সামাজিক মর্যাদা।

সমাজের অবহেলা ও লাঞ্ছনার ভয়ে এই মহিলারা সব সময়ে মরমে মরে থাকে। অদ্ভুত এক অপরাধ বোধে ভোগে। ঘটনাচক্রে এই রকম কিছু মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার সুবাদে একদিন আড্ডায় বসে মজা করে বললাম, 'কি গো, তোমরা তো এখন স্বাধীন হয়েছ, কেউ তো তোমাদের ওপর জোর করতে পারবে না। ইচ্ছে হলে কাজ করবে, না হলে করবে না। সমাজের আর পাঁচটা কাজের মতো এটাও একটা কাজ হয়ে গেছে এখন। তাই আগেকার মতন এখন কেউ আর তোমাদের মারধোর করতে পারবে না, জোর জুলুম করতে পারবে না! আইনের লড়াই চালিয়ে তোমরা জিতে গেছ। অবস্থাটা একরকম ভালোই হল কি বল! আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে ওদের হাসিখুসি মুখগুলো কেমন যেন হয়ে গেল। মনে হল প্রসঙ্গটা উঠে আসায় ওদের আড্ডার মেজাজটার তাল কেটে গেল। একটি মেয়ে প্রশ্ন করল — 'আচ্ছা দিদি, তোমায় যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি কী কর? তুমি বল চাকরি। আমরাও কি তেমনি বলতে পারব যে আমরা যৌনকর্মী। শুনে কেউ ঘেন্না করবে না? হাসবে না? পাশ থেকে উঠে চলে যাবে না তো? তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবে তো?' এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তাই চুপ করে রইলাম। অপেক্ষাকৃত বয়স কম একটি মেয়ে বলে উঠল, 'ও দিদি তোমার মেয়ে এই পেশায় আসতে চাইলে, তুমি রাজি হবে তো? আমাদের ছেলে-মেয়েদের সব সময় নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে বেড়াতে হবে না তো? স্কুলে কলেজে মায়ের পেশার জন্য তাদের লজ্জা পেতে হবে না তো?'

ওদের এই সব প্রশ্নের একটারও উত্তর আমার জানা নেই, তাই চুপচাপ ওদের কথাগুলো শুনলাম। একটু পরে অল্পবয়সী মেয়েটি বলে উঠল 'দিদি ভয় পেও না। আমরা তোমাকে গালি দেব না। তবে কি জান, ওই সব আইনি স্বীকৃতি-টিকৃতিগুলো যে কাগজে কলমে একথা তোমরাও জান, আমরাও জানি। ওসব কথা কাজে লাগবে তোমাদের বক্তৃতা দিতে কাগজে লেখালেখি করতে। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই থাকব। একটু আধটু হেরফের হবে হয়ত।'

আড্ডা থেকে উঠে পথে আসতে আসতে ভাবলাম এই সমাজ-ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে সত্যিই কি ওরা পাবে সামাজিক স্বীকৃতি? দৈনন্দিন জীবন তো আইন আর আদালত মেনে সব চলতে পারে না। কিন্তু প্রতিটি মানুষই তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রত্যাশা করে। সেই মর্যাদা তাদের কে দেবে? কবে হবে তাদের গ্রহমুক্তি? পেশার আইনি স্বীকৃতিতে ওদের অবস্থার কতটা পরিবর্তন হবে? প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরপাক খেতেই থাকে।

পূরবী ঘোষ

উমা

ঔষধ শিল্পে সংস্কার সাধনে দেরি কেন?

ভরত ডোগরা

চিকিৎসা ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি রকমের বাণিজ্যীকরণ যে রোগীদের স্বার্থের পরিপন্থী, হালফিল ঘটনাবলী তারই সত্যতা বহন করে। একদিকে ওষুধ আর চিকিৎসার জন্য তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, তার থেকেও যেটা বেশি খারাপ, তা হল রোগীর ওপর আরো বেশি ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা পদ্ধতি অথবা ওষুধ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

নিউ ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করা যাক। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শল্যবিদ বা সার্জেনরা সাধারণত সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক (fee-for-service) অথবা চুক্তি-পারিশ্রমিক (piece-rate) পেয়ে থাকেন। এই দেশটি বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বর্গরাজ্য। অন্যদিকে, ব্রিটেনে এখনও জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা (এন এইচ এস) চালু আছে এবং এর অধীনে কর্মরত চিকিৎসকেরা তাদের কাজের বিনিময়ে বেতন পেয়ে থাকেন। পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন রোগীর অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা দ্বিগুণ। আবার যে সব মার্কিন চিকিৎসক বেতনভোগী, তাঁদের করা অস্ত্রোপচারের হার অবেতনভোগীদের থেকে যথেষ্টই কম। মুনাফা অর্জন এবং অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক কিন্তু ব্রিটেনেও লক্ষ্য করা যায়। পরিসংখ্যান অনুসারে বলা যায়, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীন হাসপাতালগুলিতে ফ্রি-বেডে চিকিৎসা হচ্ছে এমন গর্ভবতী মহিলাদের তুলনায় পেয়িং-বেডে থাকা মহিলাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের হার দ্বিগুণেরও বেশি। আরো বেশি অর্থোপার্জনের জন্য ডাক্তারদের আগ্রহ এর একটা কারণ। আরো একটা কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিমার আওতায় থাকা মহিলাদের কেউ কেউ অস্ত্রোপচারের জন্য বিমার অর্থের দাবিদার হতে চান, যা তাঁরা স্বাভাবিক জন্মদানের ক্ষেত্রে দাবি করতে পারতেন না।

ঔষধ শিল্পে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য বহু জরুরি ওষুধের দামকে গরীব মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, বেশ কিছু উচ্চ-লাভজনক চটকদার ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে, যেগুলোর উপযোগিতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থেকেই গেছে। এখন ভারতে ৭০,০০০-এর কাছাকাছি ওষুধ পাওয়া যায়। এদের অনেকগুলিই অযৌক্তিক। বেশ কিছু আবার ক্ষতিকরও। এর মধ্যে রয়েছে এমন বেশ কিছু ওষুধ, বাজারে যাদের কাটতি যথেষ্ট ভালো।

সাধারণ মানুষকে যে চড়া দামে ওষুধ কিনতে হয় এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো যে অনেক কম দামে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুটি আলাদা কোম্পানির একই ওষুধ বাজারে যখন বিক্রি হয়, তখন তাদের দামের ফারাক হয় প্রচুর। শ্রেণীগত (generic) আর নামী (ব্র্যান্ডেড) ওষুধের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরো বেশি। সরকারি টেন্ডারে সাড়া দিয়ে কিছু কোম্পানি বাজারে যে দামে ওষুধ পাওয়া যায় তার দুই থেকে কুড়ি শতাংশ দামে সরবরাহ করে থাকে। বাজারে যখন সস্তা অথচ সমান কার্যকর ওষুধ সহজলভ্য, তখন ডাক্তারদের দিয়ে বেশি দামি ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লেখানো নিশ্চিত করতে বহু অসাধু উপায় অবলম্বনের খবর এখন অনেকেরই জানা। অনুরাগ ভার্গব এবং এস শ্রীনিবাসন ওষুধের দাম নিয়ে করা একটি সমীক্ষায় লক্ষ্য করেছেন: 'দুটি নামি কোম্পানি একই ওষুধ তৈরি করলেও বাজারে তাদের দামের পার্থক্য শতকরা ১০০০ ভাগেরও বেশি। উচ্চ-রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলি ৬ গুণ বেশি দাম ধার্য করে থাকে। মানসিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের ক্ষেত্রে এই দাম ১৫ গুণ বেশি। আর ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের ক্ষেত্রে ১৮ গুণ। এক্ষেত্রে কোনোরকম সরকারি হস্তক্ষেপ কিন্তু নজরে পড়ে না। ব্যবসায়ীদের বা সরকারকে যে দামে ওষুধ সরবরাহ করা হয়, ওষুধের দোকানে গিয়ে সাধারণ মানুষকে তার থেকে অনেক বেশি দামে ওষুধ কিনতে হয়। এই চড়া মূল্য তাদের গুণতে হয় ওষুধের বিজ্ঞাপনের ব্যয় মেটানো বাবদ, যা কিনা শুধু অপচয়ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিকও বটে। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে উচ্চ লাভ অর্জনের বিষয়টি।'

ওষুধ কেনার সময় গুণমান সম্বন্ধে সরকার যখন সচেতন (যেমন দিল্লী ও তামিলনাড়ু) তখন ওষুধের দাম বাজার দরের তুলনায় দুই থেকে কুড়ি শতাংশ কম। তামিলনাড়ুর এই উদাহরণটিই নেওয়া যাক। অ্যালবেনডাজোল ৪০০ মি গ্রা হল কৃমির ওষুধ। একটি কোম্পানি এই ওষুধটি ট্যাবলেট প্রতি ৩৫ পয়সা দামে সরবরাহ করার দরপত্র দিয়েছে। অন্যদিকে এই একই ট্যাবলেট বাজারে ১২ টাকা দামে বিক্রি হয়। লেখক মাইক মার্কেসি ব্রিটেনে ক্যানসারের চিকিৎসা করাচ্ছেন। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় সম্প্রতি তিনি লিখেছেন 'সুযোগ সন্ধানীদের

জন্য 'ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' একটি দারুণ উপহার। এইসব অর্থলোভী গৃধ্নুদের মধ্যে আছে বিমা কোম্পানিরা, যারা অন্যদের তুলনায় ক্যানসারে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে দশগুণ বেশি প্রিমিয়াম ধার্য করে; 'নিজের চিকিৎসা নিজে করুন' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশকের দল;এবং অবশ্যই গাদাগাদা অলৌকিক নিরাময়কারী ও 'বিকল্প চিকিৎসা' প্রদানকারী, যাদের কিনা কোনোরকম কার্যকারিতা নেই। কিন্তু এদের সবার ওপরে রয়েছে ঔষধ শিল্পের হাঙরেরা, যারা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ওষুধের গবেষণা, দাম আর উপলব্ধতাকে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে। এই শিল্পে বিক্রির ওপর লাভ সুনিশ্চিত এবং তা প্রায় ১৭ শতাংশ। এটা অন্যান্য শিল্পের গড় মুনাফার তিনগুণ বেশি। এই দাম ওষুধ তৈরি করার প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাজার কতখানি বহন করতে সক্ষম, তা হিসেব করেই এই দাম ঠিক করা হয়ে থাকে।'

ক্যানসার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কাজের কাজ করেছেন সামান্যই। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার ম্যাকফারলেন বার্ণেট বলেছেন, 'ক্যানসার নিয়ে গবেষণার ফলাফল নিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ ও পক্ষপাতহীন বলে যদি কিছু একটা করা সম্ভবপর হয়, তবে আমার বিশ্বাস যে সেই সমীক্ষক অসারতার এক চরম ধারণা নিয়ে তার কাজ শেষ করতে বাধ্য হবেন। আমরা এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য যে ক্যানসার সৃষ্টির পেছনে রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড, ক্যানসারবাহী জীবাণুর গুরুত্ব, মর্ফোজেনেসিসের নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যানসার প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে হাজার হাজার মানব-বর্ষের কাজকর্মের প্রকৃত ফল হল একেবারে শূন্য।' দু-বার নোবেলজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী লাইনাস পউলিং বলেছেন,'ক্যানসার প্রতিষ্ঠানগুলি চিকিৎসক সমাজ তথা সরকার যেভাবে মার্কিন জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা অত্যন্ত অশোভন। প্রত্যেকেরই এটা জেনে রাখা উচিত যে 'ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' একটা বিরাট ধাপ্পা, আর ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সমর্থক মানুষদের প্রতি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার করেছে। দ্য প্র্যাক্টিশনার-এর মে ১৯৯১ সংখ্যায় জীববিজ্ঞানী ডক্টর লেউইথ লিখেছিলেন, 'স্তনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে বহুবার প্রথাগত, সার্জিকাল ও কেমোথেরাপি চিকিৎসা সরাসরি সর্বনাশা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এর ফলে জীবনের মেয়াদও কমে যেতে পারে।' মাইক মার্কেসির মতে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'এক চূড়ান্ত ও অমোঘ অস্ত্র, সেই ক্যানসার 'নিরাময়কারী' ম্যাজিক বুলেটের অনুসন্ধান অন্য সব কৌশলকে ধামাচাপা দেয়। নিকসন দশ বছরের মধ্যে 'ক্যানসারের নিরাময়' হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'আমাদের সময়ে' ওবামাও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ক্যানসারের একটি মাত্র নিরাময় পদ্ধতির সন্ধান মিলবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'শোরও বেশি ধরনের ক্যানসার চিকিৎসক মহলে স্বীকৃত, আর তাদের কারণের সংখ্যা অগণিত। ক্যানসার প্রতিরোধ আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেড়ে নিয়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চূড়ান্ত অস্ত্রের সন্ধানে তা ঢালা গবেষণাকে বিপথগামী করছে। আন্তর্জাতিক গ্রামোন্নয়ন ফাউন্ডেশনের গবেষণা থেকে এটা জানা গেছে যে সাম্প্রতিক ঔষধ-সংক্রান্ত গবেষণা প্রকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন। অনিতা কুনজ্ লিখছেন, '১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে নতুন চালু হওয়া ৩৮৪টি ওষুধের মধ্যে মাত্র ১২টিকে (অর্থাৎ শতকরা ৩ ভাগ) মার্কিন খাদ্য ও ঔষধ কর্তৃপক্ষ (এফ ডি এ)রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বাকি ৯৭ শতাংশ, অর্থাৎ সিংহভাগ ওষুধকে সামান্য উপযোগী অথবা উপযোগিতাহীন বলে গণ্য করা হয়।' কিন্তু এর থেকেও খারাপ খবর আছে। এফ ডি এ-র অনুমোদন পাওয়ার পরেও অর্ধেকেরও বেশি (শতকরা ৫১ ভাগ) নতুন ওষুধ ক্ষতিকর, এমন কি প্রাণঘাতী বিপদ ডেকে আনতে সক্ষম বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। ডাক্তারদের নির্দেশমত ওষুধ খেয়ে যে সব রোগী সেগুলির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য মার্কিন হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন, তারা এরই মধ্যে বছরে চারশ কোটি ডলার এ বাবদ খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভারতের বিখ্যাত সামাজিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডা এন এইচ অনিতা বলেছেন, 'চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যকে অসুখ এবং অসুখকে শিল্পে পরিণত করেছে। খ্যাতনামা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিসিন তার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সম্প্রতি লিখেছে, 'একদল অপরিমিত লোভী চিকিৎসকই বর্তমানে অপরিমিত অর্থোপার্জনকারী চিকিৎসা পদ্ধতির জনক।'

চিকিৎসকের পেশাকে সর্বাপেক্ষা মহান পেশা রূপে গণ্য করা হয়। এই কারণেই সাম্প্রতিক এই প্রবণতা আরো বিপজ্জনক। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ঔষধ-শিল্পে, রোগ নিরাময়ের গবেষণায় এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উল্লেখনীয় সংস্কার সাধনের বিষয়টিকে আর এক মুহূর্তও উপেক্ষা করা যাবে না।

অনুবাদক : পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

The Statesman, 9.2.2010 , Why Delay Reforms in Drug Industry By Bharat Dogra.

উমা

গণপতি চক্রবর্তী

সমীরকুমার ঘোষ

(গতসংখ্যার পর)

গণপতি চক্রবর্তীকে জাদুসম্রাট বলা হত। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতীয় জাদুবিদ্যার জনক — এমন কথা বহু জাদুকরও বলছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এত কম লেখালেখি কেন—এ ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যের। গণপতিবাবুর কোনো জীবনী দূরে থাক, ওঁকে নিয়ে লেখালিখিও নজরে পড়ছিল না। অ কৃ ব ওরফে অজিতকৃষ্ণ বসু তাঁর 'যাদুকাহিনী' বইতে একটি অধ্যায় লিখেছেন। পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ'-এ তাঁর জাদু প্রদর্শনের কিছু বিবরণ আছে। জাদুসূর্য দেবকুমারের কনিষ্ঠ পুত্রের কাছ থেকে পাওয়া কিছু কিছু তথ্য ও দু-একখানি পত্রিকা এ দিয়েই চেষ্টা হচ্ছিল একটা জীবনী খাড়া করবার। যাতে অনেক প্রামাণ্য তথ্যের ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। অনেক জায়গায় অনুমান-নির্ভর হতে হচ্ছিল। লেখাটা প্রায় শেষ করার মুখে কিছু জাদুকরী ঘটনাই ঘটল। তাঁর শিষ্যদের কেউই আর জীবিত নেই — মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত যখন প্রায় পাকা, তখনই 'পুরবৈঁয়া' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় রামকৃষ্ণ সামন্তের 'জাদুপ্রভাকর' নামে একটি লেখা থেকে জানা গেল গণপতিবাবুর শিষ্য জাদুপ্রভাকর দুলালচন্দ্র দত্ত, যিনি ডি সি দত্ত নামেই বেশি পরিচিত বহাল তবিয়তে রয়েছেন। ৯৭ বছরের এই জাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকার ওরফে পি সি সরকারের সমবয়সী। উপেক্ষায়, অনাদরে পড়ে আছেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে গ্রন্থাগার-শিরোমণি বলা যায়। অজস্র মণিমুক্তোর আধার। কিন্তু খুঁজে বার করে কার সাধ্য! কারণ খোঁজার পদ্ধতি সেই বাবরের আমলেরই। সেই পদ্ধতিতে খুঁজে গণপতির গ-এরও সন্ধান মিলল না যখন, তখন দ্বারস্থ হতে হল প্রবীণ জাদুকরদের। জাদুসম্রাট প্রতুলচন্দ্রের শিষ্য শৈলেশ্বর বহু তথ্যের ভাঁড়ারী। তাঁর কাছ থেকে মিলল অযাচিত ধন। পাওয়া গেল গণপতিবাবুর লেখা বাংলাভাষায় প্রথম জাদুবিদ্যা শেখার বই 'যাদু-বিদ্যা'। প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীর। তবে তারও আগে কোনো এক প্রকাশক এটি ছাপেন। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটি ৫০-৬০ পাতার পাতলা বই। তাতে গ্রন্থকারের নামে লেখা আছে 'যাদু-বিদ্যাবিশারদ, অদ্ভুত-বিদ্যাসাগর যাদুকর শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী প্রণীত'। বইটির মূল্য ছিল আট আনা। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালে। তখন দাম ছিল এক টাকা। গ্রন্থকারের নাম লেখা হয়েছে 'ভারত-বিখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্ত্তী প্রণীত'। দ্বিতীয় সংস্করণে বইয়ের বপু বেড়েছে, পাতা ১২২। জাদুকরের নামের আগের বিশেষণের পরিবর্তন ছাড়াও বইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'প্রকাশকের কথা'য় তা উল্লিখিত—'ভারত বিখ্যাত যাদুকর গণপতির এই বইখানি দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ আমরা উহার গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়াছি।

পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় অন্য ত্রুটিও থাকা সম্ভব মনে করিয়া গণপতি বাবুর সুযোগ্য শিষ্য প্রখ্যাতনামা যাদুকর পি, সি, সরকার মহাশয় দ্বারা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করাইয়া এই সংস্করণ প্রকাশিত হইল।...'

উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় সংস্করণটি যখন প্রকাশিত হয় তখন গণপতিবাবু আর বেঁচে নেই। টীকা-টিপ্পনী সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার অবকাশও ছিল না। প্রথম সংস্করণে গণপতিবাবুর শৈশব ও বৃদ্ধ বয়সের ছবি ছিল, সেগুলির বদলে ঠাঁই পেয়েছে বৃদ্ধ জাদুকরের কয়েকটি জাদু-প্রদর্শনের ছবি। এই বই ও তার বিষয়ের কথায় পরে আসা যাবে।

শতবর্ষের দোরগোড়ায় চলে আসা জাদুকর ডি সি দত্ত কি কিছু বলতে পারবেন? সংশয় সত্ত্বেও রামকৃষ্ণবাবুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে হাজির হলাম হরিপালের বাড়িতে। গিয়ে দেখলাম

জাদুকর ডি সি দত্ত

জাদুপ্রভাকরের শরীর দিব্যি সতেজ, গমগম করছে কণ্ঠ। আর স্মৃতিতে একটুও মরচে পড়েনি। গুরু গণপতির কথায় এক লহমায় তাঁর বয়স যেন সাড়ে তিন কুড়ি কমে গেল।

দুলালবাবু হরিপালেরই লোক। যখন তাঁর বয়স বারো কি তেরো তখন তাঁদের পাড়ায় এক মুসলমান ভেলকিওয়ালা এসেছিলেন। তিনি মুঠোয় ধুলো নিয়ে চিনি করে দেন। আরও নানা খেলা দেখাতে থাকেন। ছোট দুলাল জাদুর খেলা দেখে তার ভক্ত হয়ে পড়েন। জাদু শেখার ভূত সওয়ার হয় মাথায়। তখন মেজদাদার বিয়ে হয়েছে। সে সময়ের বিয়েবাড়ি মানে বাড়িতে ভিয়েন। আর নানা ভালমন্দ খাবারের আয়োজন। দুলাল সেই ভেলকিওয়ালাকে বাড়িতে ডেকে খুব করে খাওয়ান। অমন আপ্যায়িত করে ডেকে খাওয়ানো দেখেই ভেলকিওয়ালা বুঝে ফেলেছিলেন কিশোরের মতলব। খাওয়া শেষ হলে তিনিই দুলালকে বলেন, কি ম্যাজিক শিখবে এই তো? দুলাল তো এক পায়ে খাড়া। তিনি বেশ কয়েকটা ম্যাজিক শিখিয়ে দেন। সেইগুলো মকশো করতে করতেই হাতে পেয়ে যান ভূতনাথ মান্নার এক ইংরেজি ম্যাজিকের বই। ব্যস, দুলালকে আর পায় কে! স্কুলের বন্ধুরা খেলা দেখে ধন্য ধন্য করতে থাকে। সেই বই থেকে বহু ম্যাজিক দুলালবাবু তৈরি করে নেন। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ওইসব জাদুর খেলা দেখিয়ে ভালই চলছিল। কিশোর বয়সে যা হয়, বেশ একটা কি হনু ভাব! সেই সময়েই হরিপালে জাদুর খেলা দেখাতে যান গণপতিবাবু। সেই খেলা দেখে হতভম্ব দুলালচন্দ্র। বুঝলেন, তাঁর কিছুই ম্যাজিক শেখা হয় নি! মনে মনে গুরু হিসেবে বরণ করে নিলেন গণপতি চক্রবর্তীকে। শুনেছিলেন গণপতিবাবু কলকাতার গরানহাটায় থাকেন। ঠিক করলেন কলকাতায় গিয়েই শিখবেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হরিপাল থেকে কলকাতা আসার ব্যাপারটা মোটেও সহজ ছিল না। অনেক কষ্ট করে গরানহাটায় পৌঁছে দুলালচন্দ্র শোনেন গণপতি বরানগরে ঠাকুরবাড়ি করে চলে গিয়েছেন। হাল ছাড়েন না। খুঁজতে খুঁজতে সেখানেই যান। দুলালচন্দ্র খুবই অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। গুরুদক্ষিণা হিসাবে নিয়ে যান সিল্কের উড়নি আর ক্যালিকো মিলের ধুতি। সেই ধুতি মুঠোয় পুরে ফেলা যেত, ম্যাজিক ছাড়াই! তখন সেই ধুতির দাম ছিল ১ টাকা ১২ আনা, উড়ুনির ২ টাকা ৪ আনা। রাত হয়ে যায় দেখে গণপতিবাবু আর তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেন না। দুলালবাবুর সঙ্গে ছিল সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম, প্রায় শ-তিনেক টাকা। সে সব গণপতিবাবুর জিম্মায় রেখে দেন। বাইরের একটা ঘরে তাঁর শোবার বন্দোবস্ত হয়। ভোর চারটের সময় তাঁকে ডেকে দেন গণপতিবাবু। লুচি, আলুভাজা আর হালুয়া খেতে দেন। খাওয়াদাওয়া হলে দুলালচন্দ্রকে বলেন, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তোমাকে আমি ম্যাজিক শেখাতে পারব না। দুলালচন্দ্র বিস্মিত হয়ে জানতে চান, তাঁর অপরাধ কী? পাশেই ছিলেন হিঙ্গনবালা ওরফে হরিমতী। তিনি দুলালচন্দ্রের হয়ে সওয়াল করলে গণপতিবাবু প্রায় ধমকে দেন। বলেন, 'জান না, রমেশ্বরকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলাম। আর ম্যাজিক শেখার জন্যই ওকে খুন হতে হয়েছিল! এ ভদ্রলোকের ছেলে, বড়লোকের ছেলে, একে মারতে চাও তুমি?' হরিমতী আর আপত্তি করতে পারেন না। দুলালচন্দ্রকে বিমুখ হয়েই ফিরে আসতে হয়। এরপর হঠাৎ রথের আগে গণপতিবাবুর লেখা একটি চিঠি পান। রথের দিন গণপতিবাবু বাড়িতে উৎসব করতেন। তাতে যোগদানের জন্যই বলেছিলেন চিঠিতে। লিখেছিলেন, 'দুলাল আমার বাড়িতে রথ। তুমি যদি পার তো এসো।' এই চিঠি পেয়ে আবার আশার আলো জ্বলে ওঠে দুলালচন্দ্রের মনে। তখন ভাল ল্যাংড়া আমের ঝুড়ির দাম ছিল ১ টাকা ১২ আনা। দু ঝুড়ি আম একটা রিকশয় চাপিয়ে দুলালচন্দ্র হাজির হন বরানগরে। গুরুমা হরিমতী এবং গুরু গণপতি — দুজনেই খুশি দুলালচন্দ্রকে দেখে। হরিমতী বলেন, দুলাল তোর আজ বাড়ি যাওয়া হবে না। দুলালচন্দ্র তাঁর গলায় ব্যথার কথা তুলে আপত্তি জানালে হরিমতী বলেন, 'দূর বোকা ছেলে, তোকে দুধ খাইয়ে রেখে দেব। তুই থেকে যা।' অগত্যা রাতে ফেরা হয় না। সেই টাকাপয়সা, ঘড়ি-আঙটি জমা রেখে বাইরের ঘরে রাতে শুয়ে পড়েন। পরদিন ভোরবেলা যথারীতি গণপতিবাবু দুলালচন্দ্রকে ডেকে দেন। জলখাবার খাওয়া হলে জানতে চান, 'তুমি ম্যাজিক কী শিখতে চাও?' দুলালচন্দ্র বলেন — কাটিং বক্স। গণপতি বসেছিলেন ইজি চেয়ারে। জুতো থেকে পা দুটো বার করে গুটিয়ে নিলেন। ইঙ্গিতটা ধরতে এক মুহূর্তও দেরি করেন নি দুলালচন্দ্র। বলে ওঠেন, 'ম্যাজিকটা আমার শেখা হয়ে গেছে।' শুনে চমকে সোজা হয়ে বসেন গণপতি, 'বলেন, কী করে শেখা হয়ে গেল?' দুলালচন্দ্র বলেন, 'জুতো বাঁধা থাকবে, তা থেকে বেরিয়ে আসবে পা।' গণপতির দীর্ঘদিনের সঙ্গী হরিমতী, জাদুর নাড়ি নক্ষত্র সবই তাঁর জানা। তাই দুলালচন্দ্রের মধ্যে যে জাদুপ্রতিভা লুকিয়ে আছে, তা বুঝতে তিনি একটুও দেরি করেন না। গণপতিকে বলেন, 'কী বুঝছ! একেবারে হীরে!' গণপতিও বুঝে ফেলেন যোগ্য চেলা পেয়েছেন। প্রাণভরে শেখাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, নিজের অনেক জাদু-সরঞ্জামও শিষ্যকে দিয়ে দেন। অর্গান পাইপ, সোর্ড কার্ড, ব্ল্যাক আর্ট — সব কিছুই শিখিয়ে দেন। দুলালচন্দ্রকে পরে 'প্রিন্স অভ ব্ল্যাক আর্ট' বলা হত। তবে শুধু ম্যাজিক শিখলেই হবে না। থট রিডিং, সম্মোহন, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি শিখতে হবে

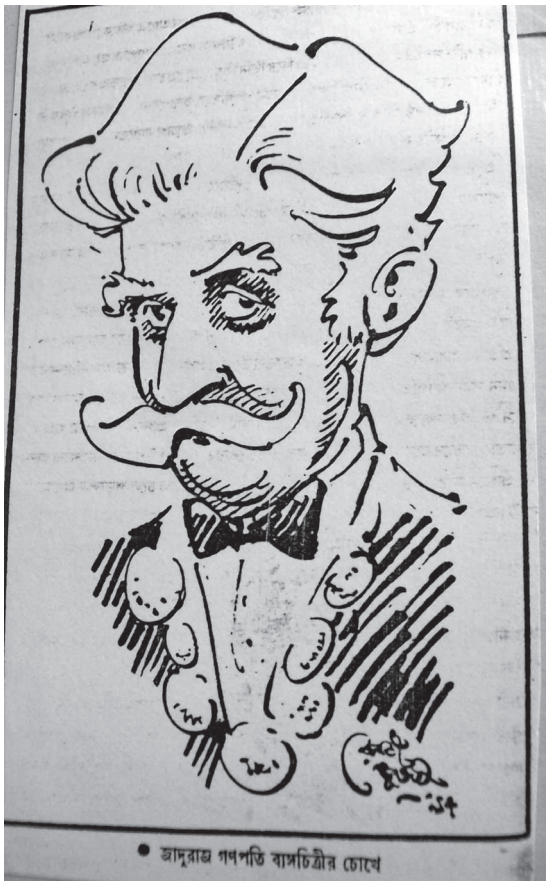

শিল্পী রেবতীভূষণের আঁকা গণপতির ছবি

— এ কথা গণপতি ওঁকে বলেছিলেন। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, চিঠি লিখে ২১ বছরের যুবক দুলালচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত সম্মোহনবিদ আর এন রুদ্রর কাছে। সপ্তাহে দু দিন করে ক্লাস করে চার বছরের পাঠ্যক্রম দুলালচন্দ্র আড়াই বছরে শেষ করেন। তালিম চলাকালীনই একটা ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন বর্ধমান মহারাজার বাড়িতে গণপতি যেতেন জাদুর খেলা দেখাতে। সেবার গণপতি শরীর খারাপের অজুহাতে শিষ্য দুলালচন্দ্রকে পাঠান খেলা দেখাতে। গণপতির বদলে এক তরুণকে দেখে মহারাজ যে অখুশি হয়েছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু স্বয়ং জাদুসম্রাট যাঁকে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, তাঁকে নাকচ করার অসৌজন্যও দেখাননি। দুলালচন্দ্রের জাদুর অনুষ্ঠান শেষে অবশ্য মহারাজ অসংখ্য সাধুবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন — 'যোগ্য গুরুর যোগ্য চেলা।' একটা শংসাপত্রও লিখে দিয়েছিলেন। অযাচিত দানে মুগ্ধ দুলালচন্দ্র সেই শংসাপত্রখানি এসে গুরুর পায়ে অর্পণ করেন। গণপতি বলেন, 'পাগল ছেলে। ওটাকে বাঁধিয়ে মাদুলি করে রেখে দে। ওঁদের বললি না কেন, তোর নাম কাগজে কাগজে ছাপিয়ে দিত।' আসলে গণপতি চেয়েছিলেন সাফল্য শিষ্যের মাথা না খারাপ করে দেয়। তাই যথার্থ গুরুর মতো ভর্ৎসনা মিশ্রিত সতর্কবাণী। এই অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করে জাদুপ্রভাকর দেশে-বিদেশে বহু অনুষ্ঠান করেছেন। বহু সম্মান, পুরস্কার পেয়েছেন। এই ৯৮ বছরের দোরগোড়ায় এসেও ভুলে যাননি গুরুকে। এখনও স্মৃতিতে অম্লান সেই দিনের ছবি। গুরুর কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন।

দুলালচন্দ্র এবং প্রতুলচন্দ্র, অর্থাৎ পি সি সরকার — একই সালে জন্মগ্রহণ করেন। দুজনে একই গুরুর শিষ্য। গণপতি দুলালচন্দ্রকে বলেছিলেন, যাই করিস, চৈতন্যটা ধরে রাখিস। মানে দেশের শেকড়কে ভুলিস না। দুলালচন্দ্র গুরুর কথা ভোলেন নি। দেশীয় খেলা দেখাতেন, তার মধ্যে থাকত পুরাণকথা, লোককাহিনী। গুরুভাই প্রতুলচন্দ্র সম্পর্কে বললেন — 'ও চলে গেল ওয়েস্টার্নে, আমি চলে এলাম ইস্টার্নে। ওর কিছু কিছু ম্যাজিক যে আমি দেখাই নি তা নয়। ও দেখাত 'ইলেকট্রিক শ'। মানে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে একটি মেয়েকে দু আধখানা করা। আমি ওই খেলাটা দেখাতাম 'হ্যান্ড শ', মানে হাত-করাতের সাহায্যে। জাদু সংখ্যা বলেছিল, বড় করাতের চেয়ে, এই খেলাটাই বেশি ভাল।'

গণপতির কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ দুলালচন্দ্রের কথা পড়ে অনেকের কাছে 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে হতে পারে। কিন্তু গণপতি চক্রবর্তীর এক সাক্ষাৎ শিষ্য বেঁচে আছেন তার কথা জানানোর লোভ সম্বরণ করা গেল না।

১৯৫০-৬০-এর দশকে 'মায়া-মঞ্চ' নামে একটি জাদুবিদ্যার পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেই পত্রিকা গণপতিবাবুকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করে। তাতে বহু জাদুকর লিখেছিলেন। সেই পত্রিকা এবং আরও কিছু লেখালিখি থেকে পাওয়া গেল বেশ কিছু তথ্য। যেমন গণপতিবাবুর জন্ম। দিনক্ষণ জানা না গেলেও জানা গেল—তিনি জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার সালিখায়, ১২৬৫ সালের কার্তিক মাসে। ইংরেজি অক্টোবর, ১৮৫৮। বাবা মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামপুর চাতরার দোড়ে পাড়ার জমিদার ছিলেন। দারুণ পাখোয়াজ বাজাতেন, ঠিকাদারি ব্যবসাও ছিল। কাকা গোপালচন্দ্রও গানবাজনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পারিবারিক সঙ্গীত ঐতিহ্যের জন্যই গণপতি অল্পবয়সে এ ব্যাপারে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে জাদুর আসরে একে তিনি কাজেও লাগাতেন। দর্শকদের চাহিদা মতো তাল বাজিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতেন।

বারো-তেরো বছর বয়সে গণপতি যখন বাড়ি ছাড়েন, তখন তাঁর এক সঙ্গীও ছিল। তিনি ছিলেন বাল্যবন্ধু মণীন্দ্রনাথ লাহা। ডাকনাম ছিল প্যাদনা। কিছুদিন পরে উৎসাহ কমে যেতে তিনি অবশ্য গণপতির সঙ্গ ছাড়েন, গণপতি একাই বেরিয়ে পড়েন।

গণপতির লেখা সেই বইয়ের প্রচ্ছদ

সাধুসন্ন্যাসী সঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। দু-একজন জাদুকরের সঙ্গও করেন। এক সময় হরবোলা, ভেন্ট্রিলোকুইজম এবং কৌতুক অভিনয়ও শেখেন।

ছোট থেকেই গণপতিকে টানত জাদুর খেলা। রাস্তাঘাটে যেখানেই মাদারি বা জাদুর খেলা দেখানো হত, দাঁড়িয়ে পড়তেন। অপলক চোখে, গভীর মনোনিবেশে দেখতেন রকমসকম। প্রথম পাতায় গণপতির শিশুবয়সের যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে, তাতে তাঁর হাতে খেলনা নয়, রয়েছে তাস। দর্জিপাড়ায় রামানন্দ পালের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিল নাট্য-সমাজ। বারো বছর বয়সে গণপতি সেখানে প্রথম ঢোকেন। ভবিষ্যৎ যাদুকরের হাতেখড়ি এই নাট্য-সমাজেই। এখানে পরিচিত হন ক্ষেত্রপাল বসাক মহাশয়ের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে নেন জাদুর প্রথম পাঠ। এরপর বলরাম দে স্ট্রিটের জহরলাল ধরের কাছে জাদুবিদ্যার অগ্রবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করেন।

গণপতির পড়াশোনা চতুর্থ শ্রেণীতেই শেষ হয়। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ কম থাকলেও পড়াশোনায় না এগনোর জন্য পিতার আর্থিক অবস্থাও খানিকটা দায়ী ছিল। জ্ঞাতি-বিরোধে জমিদারি সম্পত্তিচ্যুত হন মহেন্দ্র চক্রবর্তী। চলে আসেন হাওড়ার শালিখায়। সেখান থেকেই অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে থাকেন। মহেন্দ্রবাবু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে মানিকতলা স্ট্রিটে নিজের বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। যদিও ঘরছাড়া গণপতি সেই বাড়ির অধিকার কখনও নেননি। এই পৈতৃক বসতবাড়িটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ সড়কে পড়লে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে টাকা পেয়েছিলেন, তা দিয়ে বৃন্দাবনে বড় বোন কিরণশশী দেবীর জন্য 'কিশোরীমোহন কুঞ্জ' নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বার্ধক্যে নিজের জন্য ১১ নং আহিরীটোলায় বাড়ি কেনেন গণপতি। সেখানে থাকা কালেই বরানগরে একটি বাগান কেনেন এবং সেখানে রাধামাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন। এই বাড়িও এখন প্রমোটারের গ্রাসে। সে কথা পরে।

তিন-চার বছর জাদুবিদ্যা মকশো করে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের বাড়িতে ঘরোয়া আসরে জাদুর খেলা দেখিয়ে হাত পাকাতে থাকেন গণপতি। পেশাদার জাদুকর হিসাবে যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স বছর কুড়ি। সিমলার মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর বাড়িতে রাসযাত্রা উপলক্ষে জাদু দেখিয়েছিলেন। ২২ বছর বয়স পর্যন্ত মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে জাদুর খেলা দেখাতে থাকেন। তখনই মানুষ তাঁকে অলৌকিক শক্তিমান জাদুকর হিসাবে চিনে ফেলেছিল।

জাদুকর শৈলেশ্বর জানাচ্ছেন, লন্ডনের মাস্কেলাইনের মতনই গণপতি চক্রবর্তী হলেন কৃতী ভারতীয় জাদুকর, যিনি সার্কাসে থেকে নৈপুণ্য অর্জন করেন। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস বা বোসেস সার্কাসে জাদুকর রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ৩৫ বছর বয়সে। সেটা ১৩০০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজির ১৮৯৭। সার্কাস ছেড়ে নিজে দল গড়েন ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩) তখন গণপতিবাবুর বয়স ৫৫ বছর।

তিনি শুধু দেশের মাটিতেই খেলা দেখিয়ে বেরিয়েছেন এমন একটা প্রচার তাঁর সম্পর্কে করা হয় কিন্তু গণপতি ভারতের বাইরে বহু দেশ যেমন ফ্রান্স, জাভা, বোর্নিও, রেঙ্গুন (এখন মায়ানমারে, নাম হয়েছে ইয়াঙ্গন), মান্দানায়, ইন্দোচীন। বিদেশে তাঁর জাদুর খেলা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

আর এক জাদুকর শৈলেশ্বর লিখছেন, জাদুর ঘোর দুর্দিনে গণপতি চক্রবর্তী মশাই কোন ভরসায় এই কলাবিদ্যাকে বৃত্তি করে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ, যশ, মান— অর্জন করেছিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। ভবিষ্যৎ জাদুকরদের জন্য তিনিই গড়ে দিয়েছিলেন জাদুর স্বর্গরাজ্য। এদেশে ডাভেনপোর্ট-ব্রাদার্স, থার্সস্টন-এর মতো বিদেশী যে সব জাদুকর এদেশে এসেছিলেন তাঁরা ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন গণপতির ছায়ায়!

(চলবে)

শ্রমজীবী হাসপাতাল: এক স্বাস্থ্য আন্দোলনের নাম

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরাট ক্যানভাস জোড়া ছবির বিপরীতে এক অন্য ছবি — শ্রমজীবী হাসপাতাল। যেন এক নিটোল তৈলচিত্র। যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যায্য মূল্যে চিকিৎসা ও পরিষেবা মেলে। শ্রমজীবী হাসপাতাল এখন আর হাসপাতাল নয়, এ এক সামগ্রিক স্বাস্থ্য আন্দোলন। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে উঠছে, যার কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। হাওড়া জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য। রাজ্য ছাড়িয়ে সারা দেশ। এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে প্রতিনিয়ত রোগীরা আসছেন সুচিকিৎসার জন্য।

কারখানার নিত্য নৈমিত্তিক রুটি রুজির লড়াইয়ের পাশাপাশি ইন্দো জাপান স্টিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজের বৃহত্তর অংশের সংগ্রামের সাথী হওয়া ও তাদের সাথী করার তাগিদে কিছু চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। 'আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গড়ব' — এই প্রত্যয়ে অটল থেকে গড়ে ওঠে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প।

২ অক্টোবর ১৯৮৩ ইন্দো জাপান স্টিলস লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও পিপলস্ হেলথ্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে খামারপাড়া জাগৃতি হিন্দী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে প্রথম স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজ শুরু। মূলত সান্ধ্য বহির্বিভাগেই ছিল এই প্রকল্পের কাজ। উদ্যোগী তিন তরুণ চিকিৎসক — অনিল সাহা, রণজিৎ ঘোষ ও প্রদীপ মাইতি। এরপর ১৯৮৮-র ডিসেম্বর মাসে বেলুড় স্টেশনের পাশে নিসকো কারখানার ইউনিয়নের সহায়তায় কার্যালয় স্থানান্তরিত। সান্ধ্য বহির্বিভাগ ছাড়াও এখানে শুরু হল ছোট ছোট অস্ত্রোপচার। ডাঃ রণজিৎ ঘোষের আকস্মিক মৃত্যু ও অন্য কিছু কারণে কর্মসূচির সাময়িক শ্লথ গতি। ১৯৯১ সালে 'বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি'র নিবন্ধীকরণ। জানুয়ারি ১৯৯৪ নিসকো কর্মী সংগঠনের অনাগ্রহে এই কেন্দ্রের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১লা মার্চ ১৯৯৪ ইন্দো জাপান স্টিলসের পাশে গ্রান্ড স্মিতির পরিত্যক্ত বাড়ির সংস্কার সাধন করে শ্রমিকদের শ্রমে-ঘামে-আবেগে শ্রমজীবী মানুষের সহায়তায় শ্রমজীবী হাসপাতালের যাত্রা শুরু। প্রথমদিকে বহির্বিভাগ। ধীরে ধীরে অপারেশন থিয়েটার ও অন্তঃবিভাগ চালু ১৯৯৫ সালের জুন মাসে, শয্যা সংখ্যা ১৫।

বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শ্রমজীবী হাসপাতালের অগ্রগতি রুখতে প্রমোটার, মিল মালিক প্রশাসনের একটা অংশ এক হয়ে ২৬ এপ্রিল ১৯৯৭ দুপুর ১২টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসপাতালের ওপর। ওরা ভেবেছিল হাসপাতালের মৃত্যু হবে। কলকাতা হাইকোর্টে নারকীয় পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে জনস্বার্থবাহী মামলা দায়ের করা হয় [WP No. 8186 (w) of 1997]। মহামান্য আদালতের নির্দেশে তদন্তের জন্য স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ে যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় সব চক্রান্ত।

ইন্দো-জাপান স্টিল লিমিটেডের মালিক শিউকুমার আগরওয়াল, প্রোমোটার গোয়েল এবং তাদের স্বার্থরক্ষাবাহী তথা তল্পিবাহক পুলিশ নানা সময়ে একের পর এক মিথ্যা মামলা এনেছে হাওড়ার আদালতে শ্রমজীবী হাসপাতালের পরিচালন কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সব মিথ্যা মামলা হাসপাতালের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে পারে নি। রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের সভা থেকে শ্রমজীবী হাসপাতাল 'বাঁচাও কমিটি' গঠিত হয়। মিছিল, সভা ও প্রচার পুস্তিকায় প্রতিবাদে প্রতিরোধের শপথ নেওয়া হয়। অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, গণ-সংগঠন, মানবাধিকার কর্মীরা হাতে হাত মিলিয়ে শ্রমজীবী হাসপাতালের লড়াই-এ সামিল হয়।

শ্রমজীবী হাসপাতালের ইতিহাসে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অসমসাহসী পরিকল্পনা যা সফল ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা হল —'হৃদয় ছুঁয়ে'। মাত্র ২৫ হাজার টাকায় 'বিটিং হার্ট' পদ্ধতিতে বাইপাস সার্জারি। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন ছিল এক কোটি টাকার। যা সংগৃহীত হয়েছে সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে ও বিভিন্ন গণ সংগঠনের নানান সহায়তায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। ২৭ মার্চ ২০০৫ কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়। শ্রমজীবী হাসপাতালে আজ পর্যন্ত তিনশোর বেশি মানুষের হৃৎপিন্ডের জটিল 'বাইপাস' অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। 'হৃদয় ছুঁয়ে' প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত বেলুড়ে আসেন তীর্থ করতে। সেই স্থান যে কোথায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতুলবাবু জানান যে তিনিও আসেন তীর্থ করতে এই বেলুড়ে। তবে তাঁর তীর্থ করার স্থান — বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল।

ইতিমধ্যেই বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে দুটি কেন্দ্র সফল ভাবে চালু আছে। একটি প্রত্যন্ত সুন্দরবনে সরবেড়িয়ায়। যেটিতে শুধু বহির্বিভাগ নয়, অন্তর্বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটার চালু হয়েছে। যার নাম — সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল। আর

একটি কেন্দ্র শেওড়াফুলিতে। যেখানে শুধুমাত্র বহির্বিভাগ। এটির নাম— শেওড়াফুলি শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি।

২ অক্টোবর ২০০৮। শ্রমজীবী হাসপাতালের রজত জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে এখানে যে সব নিয়মিত বিভাগগুলি চলছে সেগুলি হল — সাধারণ, শল্য, অস্থি, হৃদরোগ, কার্ডিয়াক সার্জারি, শিশু, দন্ত, নাক-কান-গলা, চক্ষু, চর্মরোগ, মেডিসিন, স্ত্রী প্রসূতি, আকুপাংচার, রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা, ডায়ালিসিস ইত্যাদি। বর্তমানে বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালে রোগীর চাপ প্রতিনিয়ত। শুধুমাত্র স্থানের অভাবে বহু রোগীকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। স্থানাভাবে শুরু করা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিভাগ। এই স্বল্প পরিসরে চিকিৎসক, রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাশ্রমদাতা সকলেরই স্থানাভাবে নাভিশ্বাস উঠছে। তাই হাসপাতালের সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। চাই নতুন ঠিকানা। সেই নতুন ঠিকানা — হুগলীর শ্রীরামপুরের অনতিদূরে পিয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলুমিল্কী গ্রামে। এই প্রকল্পের নাম — চাই স্বাস্থ্য, চাই প্রাণ। ১লা মে ২০১০ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়ে গেল। এখানে ৭৫ বিঘা জমির ওপরে এক সুপার স্পেশালিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে এক ছাদের নিচে সমস্ত বিভাগের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এর সঙ্গেই গড়ে উঠবে মেডিক্যাল কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র।

অত্যাধুনিক ৫০০ শয্যার হাসপাতাল গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে খেলার মাঠ, পুকুর, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঔষধী গাছের বাগান, ওষুধ ও যন্ত্রপাতি তৈরির মেশিন শপ, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, পাঠাগার, বৃদ্ধাবাস ও স্কুল। এই স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরেই এক নতুন স্বপ্ন — কে জি টু পি জি। শিশুরা এখানে কে জি ক্লাসে ভর্তি হয়ে এখান থেকেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করতে পারবে।

প্রস্তাবিত হাসপাতালে যে সব বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল — জেনারেল, মেডিসিন, সার্জার, চোখ, দাঁত, নাক-কান-গলা, বক্ষ, হাড়, স্ত্রীরোগ, শিশু, চর্মরোগ, রক্ত, গ্যাস্ট্রোএন্টোরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, কার্ডিয়োলজি, নিউরোলজি, অঙ্কোলজি, জেরোন্টলজি, কিডনি, লিভার, কর্ণিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জারি, জেনেটিক্স, সাইকিয়াট্রিক কমিউনিটি মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি। এর সাথে ডায়ালিসিস ইউনিট ব্লাড ব্যাঙ্ক, হিমোফিলিয়া থ্যালাসেমিয়া ডিটেকশন সেন্টার সহ প্রায় সব ধরনের ডায়গোনিস্টিক সেন্টার।

যাঁরা চাইবেন তাঁরা এখানে আড়াই কাঠা প্লট নিয়ে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ী বসবাসও করতে পারবেন। যে সব শ্রমজীবী সমর্থক বন্ধু বা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছেন, তাঁরা তাঁদের পেশাগত দক্ষতা দিয়ে শ্রমজীবীর সার্বিক বেঁচে থাকার অবদান রাখতে পারবেন। যাঁরা বৃদ্ধাবাসে থাকবেন, তাঁরা একাকিত্বের বোঝা নিয়ে বৃদ্ধাবাসের চৌহদ্দিতেই আটকে থাকবেন না। সামর্থ্য-দক্ষতা-ভাবনা দিয়ে দৈনন্দিন কাজে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারবেন। যাঁরা চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মী নন তাঁরা বৃহৎ শ্রমজীবী পরিবারের অন্যান্য কাজ সামলাবেন। সুস্থ পরিবেশ স্বপ্ন নিয়ে সামগ্রিক মানুষের এক বৃহৎ শ্রমজীবী পরিবারের একত্রিত থাকার এক অন্য ভাবনা এই প্রকল্প। এই হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ও রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমি কেনা, ভবন নির্মাণ ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রথম দু বছরে আনুমানিক খরচ দশ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই অর্থ পুরোটাই অনুদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। 'হৃদয় ছুঁয়ে'-কে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে যেভাবে সাহায্য পাওয়া গেছে শ্রমজীবী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে এই প্রকল্পেও সেইভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে।

নতুন কলেবরে শ্রমজীবী হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে যারা সাহায্য করতে চান তাঁরা প্রযোজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়— ৫, জি টি রোড, বেলুড়, হাওড়া। ফোন ২৬৫৪-১১৮১/২৮৭৭-০১১২। শ্রীরামপুরে অস্থায়ী কার্যালয় — অগ্নিমা অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯ মুখার্জি পাড়া লেন (ইউ বি আইয়ের রিজিওন্যাল অফিসের পাশের রাস্তা)।

প্রতিবেদক সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে আলোচনা সভা

রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে সাম্প্রতিক চর্চার ধারাবাহিকতায় বই-চিত্র গত ১৬ এপ্রিল ২০১০-এ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল কফি হাউস-এর দোতলায়।

রাধানাথ গবেষক অজানা চৌধুরি রাধানাথের প্রতিভার নাগাল পেতে বহু তথ্য সংগ্রহ করার কাজ যে কতটা জরুরি তা বললেন। রাধানাথ চর্চার একটি রূপরেখা তৈরি করার ওপরও তিনি জোর দিলেন।

আশীষ লাহিড়ী তাঁর সম্প্রতি Beyond the Peak বইটি লিখতে অজানা চৌধুরির ও কেলকারের উৎসাহদানের কথা শ্রোতাদের জানালেন। শ্রোতাদের নানান প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্রীমতী চৌধুরি। ২০১৩ রাধানাথ শিকদারের জন্মের দ্বিশতবর্ষ। সমর বাগচী বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায় ঐ বছরেই 'রাধানাথ শিকদার গ্যালারি' খোলার প্রস্তাব দেন এবং আর এখন থেকেই তার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বললেন।

পুস্তক সমালোচনা

রাধানাথ: আত্মবিস্মৃতির একটি অধ্যায়

জয়ন্ত দাস

Radhanath Sikdar - Beyond the Peak by Ashish Lahiri

প্রকাশনা - বই-চিত্র, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০। মূল্য ৪৫ টাকা

'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।'

—উগ্র জাতীয়তাবাদী? নিশ্চয়ই। ভুল ইতিহাস? তা-ও। কিন্তু লাইনদুটো সত্যি। সত্যি এক বিশেষ অর্থে। যে অর্থে নেহাতই সামান্য মানুষ আমেরিগো ভেসপুচির নামে দুটো বিশাল মহাদেশ পরিচয় পায়, সেই অর্থে।

কথাটা এখানেই যে বিজয়ীদেরই একমাত্র অধিকার আছে নামকরণে। বিজয়ীদের অধিকার আছে তাদের দেওয়া নাম অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার। এবং বিজয়ীর অধিকার আছে ইতিহাস নির্মাণ করবার। আর সেই নির্মাণের প্রতি ধাপে ইতিহাসকে পরিশুদ্ধ করে করে ক্রমশ কয়েকজনের ইতিহাসকে সার্বজনীন ইতিহাসে পরিণত করার, অন্য সব মানুষকে ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক অন্ত্যেবাসীতে পরিণত করার। এবং সর্বোপরি, অন্য সব মানুষকে সেই ইতিহাসকে একমাত্র ইতিহাস বলে মেনে নেওয়ানোর যে ইতিহাস সেই সব মানুষকেই বাদ দিয়ে, নিদেনপক্ষে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে রচিত হয়েছে এবং রচিত হয়েই চলেছে।

রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে আশীষ লাহিড়ী ইংরাজি ভাষায় একটি ছোট বই লিখেছেন। বইয়ের পেছনের মলাটে লেখা আছে যে এটিই রাধানাথের ওপর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। আচমকা শুনলে কিছুটা বিস্মিতই হতে হয়, কেননা রাধানাথ খ্যাতকীর্তি পুরুষ। সেই ইংরেজ আমলেই মাপজোক করে হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গটিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর এই কীর্তি ইংরেজরা স্বীকারও করে নিয়েছিল। (সত্যি কতটুকু জানি রাধানাথ সম্পর্কে!), রামানুজম-এর মতো রাধানাথকে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দিনগুলোতে জানা জিনিসকে পুনরায় জানতে গিয়ে পণ্ডশ্রম (পণ্ডশ্রম অবশ্য নেহাত উপযোগিতাবাদী দৃষ্টি থেকে) করতে হয় নি, মেঘনাদ সাহার মতো গরুর গোয়ালে বাস করে স্কুলে পড়তে হয় নি, বিদ্যাসাগরের মতো দারিদ্রকে জয় করে একদিকে টিকি অন্যদিকে হ্যাটকোটের সঙ্গে একক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয় নি। কাদম্বিনী দেবীর মতো প্রবল সামাজিক বাধার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই ও আপস করতে করতে ডাক্তারি শিখতে ও করতে হয় নি, মহেন্দ্রলাল ... যাক্, তালিকা দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জ্ঞান ও ক্ষমতার গাঁটছড়ার প্রতিভূ ইংরেজদের রয়্যাল সোসাইটি-র সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্যটি (ইহারা বাস্তবিক হারামজাদা) করেছিলেন, তাতে অধীন ভারতীয়দের কৃতিত্ব প্রচারে ইংরেজ পণ্ডিত, বিশেষত ক্ষমতাবলয়স্থ পণ্ডিতরা যে কীরকম সাহায্য করতেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা আমাদের হয়েছে। তাই রাধানাথের এভারেস্ট মাপার কৃতিত্বটা যে তাঁকেই দেওয়া হল, এতে, এতদিন আমরা কিঞ্চিৎ অবাকই ছিলাম, এবং 'যাহোক কিছু ভদ্রগোছের ইংরেজ ক্ষমতাবলয়ে ছিল' বা 'বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন চরিত্রের কাছে জাতিগর্ব যে কীভাবে হার মানে' বা 'বোধকরি রাধানাথ ধামাধরা গোছের লোক ছিলেন বলে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত তাঁর পিঠটা চাপড়েই দিল' — ইত্যকার যে যার পছন্দের মনোগত আখ্যান রচনাও যে করিনি তা নয়। এমন সব 'ইতিহাসবোধ'-এর ওপরে আশীষ লাহিড়ীর নিরীহদর্শন ক্ষুদ্র বইটি একটি সজোর চপেটাঘাত। এই বইয়ে পরতে পরতে বিধৃত হয়েছে রাধানাথের সত্যিকারের কৃতিত্ব, যা তাঁর স্বীকৃত কৃতিত্বের চাইতে অনেক বেশি। আর যেটুকু কৃতিত্ব আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা (ও পরবর্তীকালে বাদামী প্রশাসকেরা) তাঁকে দিয়েছেন তা নেহাত বাধ্য হয়েই।

কারো তো একটা দায়িত্ব এসেই যায় এতবার এতভাবে ভুলে যাওয়া এই ভদ্রলোকটিকে একবার মনে করানোর। মধ্যমেধার জয়গানমুখরিত আজকের এই দিনে একটা সময়কে মনে করানোর, সে সময়ে চারিদিকে পাশ্চাত্যের অজস্র অনুকরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঙালী তথা ভারতীয়ের স্বীয় বৌদ্ধিক কীর্তি স্থাপন করতে হত অভিমন্যুর মতো একক সংগ্রামে। আশীষ লাহিড়ী ঠিক এটুকুই করেছেন। একটা ছোট বইতে কমবেশি গোটা চল্লিশ পাতায় রাধানাথকে পুরে ফেলা কঠিন, এবং লেখক

সে পথে হাঁটেন নি, সেই মানুষটি ও সেই সময়কার একটা ছবি আঁকারই চেষ্টা করেছেন। আশীষবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি এই সংক্ষিপ্ত ছবি আঁকার কাজটা একেবারেই সংক্ষেপে সারেন নি, বহু দলিল ঘেঁটে চিত্রতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিশেষে দু-একটা বিষয় নিয়ে মৃদু অভিযোগও জানাতে হয়। ৪৮ পাতার এই বইটিকে ঠিক বই বলা যায় না, পুস্তিকাই বলতে হয়। সে হিসাবে এর ৪৫ টাকা দামটা একটু বেশি। প্রচ্ছদের চিত্রটি দুর্লভ। কিন্তু তার উপস্থাপনা ভাল হয় নি। আর বইটা বাংলাভাষায় লিখলে আরো কিছু মানুষ হয়তো একটু ভালোভাবে রাধানাথ ও সেই সময়কে চিনে নিতে পারতেন এই সময়ের দর্পণে।

আশ্চর্য লাগে, সাধারণ জ্ঞানের বইতে 'এভারেস্টের উচ্চতা কে মাপিয়াছিল? — রাধানাথ শিকদার', এর বাইরে আমরা কিছুই জানি না ওঁর সম্পর্কে। বলা ভাল, আমাদের কেউ তেমনভাবে জানানও নি কেউ! 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ শিবনাথ শাস্ত্রী একটি ছোট অধ্যায় লিখেছেন। সে বই-ই বা কজন পড়েন! একজন বাঙালি যুবক কী অসম্ভব মেধায়, শ্রমে কাজ করেছেন — তা এই বইটি না পড়লে অজানাই থেকে যেত। রাধানাথ যে আবহাওয়া বিজ্ঞান নিয়েও অনেক মৌলিক গবেষণা করেছেন, তাও জানা হত না। আশীষবাবু এই বইটি লেখার মধ্যে দিয়ে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন।

উ মা

এখানে - ওখানে

মরা ছেলে বেঁচে গেল

৭ বছরের অমিত পাশোয়ান। ভাগলপুরের গ্রামে বাড়ির বাইরে খেলতে খেলতে সাপের কামড় খায়। বাড়ির লোকেরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার ছেলেটিকে মৃত ঘোষণা করে। বাড়ির লোকেরা 'মরা' ছেলেকে ভেলায়/মান্দাসে শুইয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। সেই 'মরা' ছেলে আজ বছর কুড়ির যুবক। পরণে সাধুর বেশ। বেহালায় ধর্মীয় গানের সুর বাজিয়ে শোনাচ্ছে বাড়ির লোকদের। তাজ্জব বনে গেছে সবাই। তার বেঁচে ওঠার কাহিনী সে শুনিয়েছে সবাইকে। তাকে যাঁরা বাঁচিয়েছে তাঁদের মুখ থেকে সে শুনেছে ঐ ঘটনা।

গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে মান্দাস/ভেলা পশ্চিমবাংলাঞ্চে ঢুকে পড়ে। গঙ্গার ঘাটে কয়েকজন সাধু স্নান করছিল। তাঁরা ভেলা থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ছ-মাস অমিত কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে হাসপাতালে ছিল। সাধুরা আশা ছাড়েনি। অবশেষে জ্ঞান ফেরে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর ঐ সাধুবাবারা তাকে ধর্মীয় শিক্ষাদান করে এবং সেও তাঁদের একজন বনে যায়। আর অমিতের বাবা নরেশ পাশোয়ান। 'মরা' ছেলেকে নিজে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই মরা ছেলে আজ ফিরে এসেছে। বাবার আনন্দ দেখে কে!

সংবাদসূত্র : 'Boy declared dead by doctor found alive' - The Statesman, 2.4.2010 (page 4)

কিছু প্রশ্ন, কিছু কথা

দীর্ঘদিন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে উৎস মানুষ, জানুয়ারি, ২০১০-সংখ্যা পড়ে আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছে তা লেখা ধরে ধরে বলার চেষ্টা করলাম —

আমাদের কথা : যথোপযোগী

বেহিসেবি খরচ : দীর্ঘ হলেও খুব ঝরঝরে ভাষা। সাব হেডিং দিয়ে লেখাটি আরও আকর্ষণীয় করা যেতে পারত।

কল্পলোকের নায়ক গণপতি : বিস্মৃতিতে চলে যাওয়া একটি মানুষকে লেখক যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। তবে লেখা বড্ড ফেনানো মনে হচ্ছে। উপরন্তু 'নাকি', 'নাকি' শব্দ দিয়ে লেখা 'উৎস মানুষ'-এর বিরোধী। (অনুচ্ছেদ ৪, ১০, ১২) উপরন্তু 'টোট্‌কা, দ্রব্যগুণ, মাদুলি ... ইত্যাদি-তে 'নাকি' কে কোথায় 'উপকার', 'কাজ' পেয়েছে এগুলো 'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে সর্বনাশা জিনিস। (অনু: ১০, ১২, পৃ ১২)

আইলা ও প্রশ্নের ঝড় : উপযোগী বিষয়। তবে 'আইলা'-র কারণটি ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় নি। 'এইসব দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ যা পারছে আমরা তা পারছি না কেন?' — অনু: ৩, পৃ ১৪ — লেখক নিজে এই প্রশ্ন তুলেও তাঁর উত্তর কি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হল? উপরন্তু 'দুর্ভাগ্য', 'সৌভাগ্য' (অনু: ৪, পৃ ১৪) শব্দগুলো ব্যবহার হচ্ছে কেন?

'প্রেমানন্দ নেই...' এবং 'লড়াকু বন্ধু আর নেই' : দুটো দু রকম স্বাদের লেখা। ভাল।

'কুষ্ঠ কি সারবে? : অতি প্রয়োজনীয় লেখা। কিন্তু এত বড় যে পাঠকের ধৈর্য থাকবে না। সাব হেডিং বড় কাব্যিক। বিষয় অনুযায়ী লেখাটিকে দুভাগে ভাগ করা যেত। একটা অংশ সাধারণ পাঠকদের দিকে তাকিয়ে, আর একটা অংশ একটু বিস্তৃত ও গভীরে জানার জন্য।

বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রসার নিয়ে সর্বভারতীয় সম্মেলন: একটু ভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রতিবেদন। ভাল।

আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ ও পাথর : একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এর প্রশাসনিক ও পরিকল্পনার দিকটাই বেশি বলা আছে। বৈজ্ঞানিক দিকটি একেবারেই নেই।

মুক্তি আন্দোলন দমন : শিরোনামে 'দমন' কথাটি বেমানান। বিষয়টি তথ্য বহুল হলেও 'উৎস মানুষ'-এ দেওয়া যায় কি? যায় না।

বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি : বিষয় ভাল। লেখাও ভাল। তবে 'শিরোনাম' ও 'সাব হেডিং'গুলি আরও আকর্ষণীয় করার দরকার ছিল।

বিজ্ঞানের বিভীষিকা : খুবই ভাল আহরণ। তবে লেখকের নাম ও পরিচয় শিরোনামের নিচে দিলে ভাল হত এবং দেওয়ার দরকারও ছিল।

যুগলকান্তি রায়

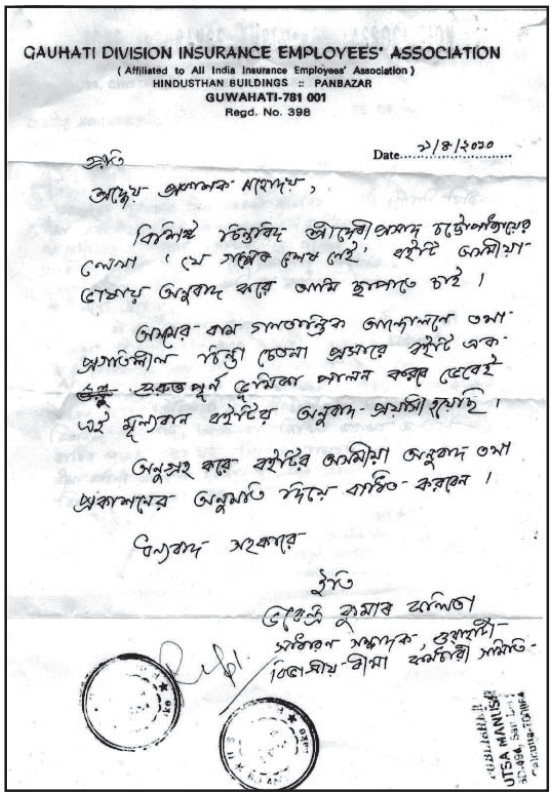

GAUHATI DIVISION INSURANCE EMPLOYEES' ASSOCIATION
(Affiliated to All India Insurance Employees' Association)
HINDUSTHAN BUILDINGS :: PANBAZAR
GUWAHATI-781 001
Regd. No. 398

Date ২/৪/২০১০

প্রতি
শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহোদয়,

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করে আমি ছাপাতে চাই।

অসমের বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তথা প্রগতিশীল চিন্তা চেতনা প্রসারে বইটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভেবেই এই মূল্যবান বইটির অনুবাদ-প্রয়াসী হয়েছি।

অনুগ্রহ করে বইটির অসমীয়া অনুবাদ তথা প্রকাশনের অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদ সহকারে

ইতি
ভূপেন্দ্র কুমার [illegible]
সাধারণ সম্পাদক, গুয়াহাটী-বিভাগীয়-বীমা কর্মচারী সমিতি

UTSA MANUSH

সুখবর। 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটা আসামের গুয়াহাটি ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ছাপতে চায়। অনুমতি চেয়ে পাঠানো সেই চিঠি র প্রতিলিপি।

বর্ষবরণ

১লা বৈশাখ, ১৪০০ সাল। 'হিন্দোল, বড়জাগুলি'র প্রভাতফেরীর মাধ্যমে বর্ষবরণ শুরু। প্রতিটি বৎসরের এই বর্বরণের পথ পরিক্রমার পর আবার এই দিনটির জন্য সারাটি বছর সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা। এমনই প্রাণের সৃষ্টি এই প্রভাতফেরী। তবে জাঁকজমকপূর্ণ কিছু নয়। একটি ম্যাটাডোরকে ফ্ল্যাগ, ব্যানার, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। শিল্পীদের মধ্যে যে কয়েকজনের জায়গার সঙ্কুলান হয় তাঁরা ম্যাটাডোরের পাটাতনে উঠে বসেন, বাকিরা পায়ে হেঁটে পরিক্রমায় অংশ নেন। পাটাতনে বসা শিল্পীরাই সামগ্রিক পরিক্রমা পরিক্রমা পরিচালনা করেন। পরিক্রমায় থাকে প্রাসঙ্গিক ভায্যপাঠ, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ইত্যাদি। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে ও শিশুরা যারা নাচে, গানে, কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেয় তারা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ম্যাটাডোরের সাথে সাথে এগিয়ে চলে। সাথে থাকেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের মায়েরা আর এ ছাড়া থাকেন এলাকার কিছু উৎসাহী সকল বয়সী মানুষ। শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলা ম্যাটাডোর কোনও রাস্তার মোড়ে, কোনও মাঠের কোনায় পনেরো/কুড়ি মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। পথ চলতি ও আশপাশের মানুষ জড়ো হন। শুরু হয় ক্ষণকালের জন্য নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তির আসর। আমরা একে স্পট প্রোগ্রাম বলি। দু-তিন মিনিট স্পট প্রোগ্রাম সহ ঘণ্টা দুয়েকের প্রভাতফেরী উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে শেষ হয়।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও বড়জাগুলি তরুণ সংঘ থেকে প্রভাতফেরী শুরু হয়। রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন বাগানবাড়ি, গোপাল রোড, বড়জাগুলি গ্রামীণ হাসপাতাল, বড়জাগুলি চৌমাথা হয়ে তরুণ সংঘ প্রাঙ্গণে এসে পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে। লেবু-চিনি-নুনের শরবৎ সানন্দে সামান্য জলযোগ গ্রহণ শেষে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ষবরণে ছেদ পড়ে নি। তবে এ রকম একটি সেকুলার উৎসবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের যে সচেতন আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকা দরকার ছিল তার অভাব প্রকট। আক্ষরিক অর্থেই সার্বজনীন এ ধরনের উৎসবে মানুষ মনের খোরাক পাবে এ আশাতেই আমাদের পথ চলা।

হিন্দোল, বড়জাগুলি, নদীয়া।

<u>একটি প্রতিবেদন</u>

চিত্তদাকে যেমন দেখেছি

২০০৮-এর ডিসেম্বরে বড়জাগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু। অতিথি অভ্যাগত, স্বেচ্ছাসেবক ও ক্রীড়া পরিচালকদের জন্য চা-তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চা-তৈরির সব রকম সরঞ্জাম যেমন কেরোসিন তেলের স্টোভ, কেরোসিন, চা, ছাঁকনি ইত্যাদি সব জোগাড়। সঙ্গে একটা ভাবনা কিন্তু আমায় পেয়ে বসল। তা হল চা করবে কে এবং সবাইকে দেবে কে? আমাকে অবাক করে দিয়ে দেখলাম কোথা থেকে চিত্তদা (প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দেবনাথ) এসে হাজির। চা তৈরি থেকে বিতরণ একাই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সহকারে সারাদিন এই তথাকথিত তিন নম্বরের কাজটিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্তদার এই সানন্দে চা তৈরি ও বিতরণ — তার মধ্যে আমি নিজেও দু'একবার চিত্তদার চা খেয়েছি। দেখে মনে হয়েছে কত অন্তর দিয়ে তিনি ক্রীড়া উৎসবকে ভালবাসেন, ক্রীড়া উৎসব তাঁর কত আপন। ক্রীড়া উৎসবের কোনো কাজই ছোট নয়। যে কোনো সৃষ্টিকে গভীরভাবে অন্তর থেকে ভালবাসলে তার জন্য যে কোনো কাজ সানন্দে করা যায়, চিত্তদা তার প্রত্যক্ষ নজির। এখানেই শেষ নয়, চা তৈরির সরঞ্জাম সব বুঝিয়ে দিয়ে আমার হাতে ক্রীড়া উৎসবের জন্য ৫০ টাকা গুঁজে দেলেন। আমি নিতে অসম্মতি জানালে ঝামটা মেরে বললেন কত টাকা কত দিকে যায় আর খেলার মতো ভাল জিনিসে দু'টো টাকা দেব সে আর বেশি কি! ক্রীড়া উৎসবের মাধ্যমে চিত্তদার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় দিক ফুটে উঠল। আমরা যেন আমাদের জীবনেও শিক্ষাটি গ্রহণ করি।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

WB/EC 228 **ISSN 0971-5800** **R.N. 37275/80** **Rs. 15.00**

উৎস মানুষ ৩০ বর্ষ এপ্রিল - জুন ২০১০ ১৫ টাকা

পুস্তক তালিকা

ছাপা আছে

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান(১ম) ৩৫.০০

সংকলন

যে গল্পের শেষ নেই ৪০.০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) ৪২.০০

সংকলন

প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ ৩০.০০

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) ১৮.০০

রণতোষ চক্রবর্তী

বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু ৪০.০০

হিমানীশ গোস্বামী

এটা কী ওটা কেন ৩০.০০

সংকলন

'আমরা জমি দেই নি, দেব না' ১০.০০

আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান ৫০.০০

সংকলন

আরজ আলী মাতুব্বর ২০.০০

ভবানীপ্রসাদ সাহু

প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়) ৬০.০০

বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক

নিরঞ্জন ধর (একত্রে যন্ত্রস্থ)

ছাপা নেই

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (সংকলন)

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)

স্বাস্থ্যের বৃত্ত

প্রমিথিউসের পথে

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? (৩য় প্রকাশ)

শেকলভাঙা সংস্কৃতি - ৪

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

সংকলন

কী আর কেন

চলতে ফিরতে

বিজ্ঞানকে মুখোশ করে

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারি ২০০০, ১ম)

খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়)

লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি

নিজের মুখোমুখি : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি ডি ৪৯৪ সল্ট লেক, কলকাতা ৬৪ ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/
৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com ই-মেল : jhilly_banerjee@yahoo.co.in

প্রাপ্তিস্থান

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বি বা দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)

'উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক কলকাতা - ৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৩১হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই - নিবারণ সাহা।